বালার্ক
North Eastern Journal for Arts & Social Science

Editorial Board (2020)

Nandita Basu
Prof. (Reid) Deptt. MIL & LS
University of Delhi

Chandrika Basu Majumder
Prof. Dept of Pol Sc
Tripura University

Krishna Bhattacharjee
Asso. Prof. Dept of Philosophy
Tripura University

Amalendu Bhattacharjee
Asso. Prof. (Retd)
Dept of Bengali
Gc College. Silchar

Biswatosh Choudhory,
Prof. Dept. of Bengali,
Assam University, Silchar

Dipendu Das
Prof. Dept. of English,
Assam University, Silchar

Priyakanta Nath
Prof. Dept. of Bengali,
Assam University, Silchar

Debasis Bhattacharjee
Prof. Dept. of Bengali,
Assam University, Silchar

Binita Rani Das
Prof. Dept. of Bengali,
Gauhati University, Gwahati

Nirmal Das
Asstt. Prof. Dept of Bengali
Tripura University

Bindu Ranjan Chakma, Asso. Prof.
Dept. of Public Administration,
MBB University, Agartala

Prasun Barman
Assoc. Prof. Dept of Bengali
Cotton State University

Bhaskar Roybarman
Eminent Writer & Editor,
Agartala

Editor
Malay Deb

Bengali Copy Editors
Ankur Debbarma
Nabashrita Modak
Pranab Kr. Das

English Copy Editors
Chandana Nath
Nirmalya Karmakar

Treasurer
Debarati Dey

ISSN 2394-6113

বালার্ক

Baalark

North Eastern Journal for Arts & Social Science

A peer reviewed multidisplinary research Journal

2021

Volume

7

Issue - I - II

Arts & Social Science Forum of North East

Deb Bhavan, Suryamaninagar, Agartala - 799022

Baalark

North Eastern Journal for Arts & Social Science

2021

Volume - 7

Issue - I - II

First Published

June - December 2021

Editor

Malay Deb

Published By
Kousik Nandi, on behalf of

Arts & Social Science Forum of North East

Contact Address
Deb Bhavan, Suryamaninagar, Agartala - 799022
Phone - 9612617795, 7896322983

Printted By
Sagarika Press, kolkata - 09

সম্পাদকীয়

অতিমারি মানুষের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দপতন ঘটিয়ে দিয়েছে এটা সত্য, কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ শত বিপর্যয়েও থামতে নারাজ। সামান্য এই জীবাণু যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার গতি থামিয়ে দিতে চাইছে, পরিবর্তিত করছে সেও কী অমৃতের সন্তানদের সৃষ্ট না প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এনিয়ে দ্বন্দ্ব এখনো কাটেনি। আমরা সকলেই জানি, সৃষ্টি ও ধ্বংস প্রকৃতির দুই হাত। মানুষের মধ্যেও এই উভয় গুণ বিদ্যমান। মানবজাতির এই সৃষ্টিশীলতাই তাঁকে সমস্ত বিপর্যয় মোকাবিলা করার শক্তির জোগান দেয়। তাই বাইরের জগৎ যখন পরিস্থিতির চাপে বন্ধ হয়ে যায় তখন মানুষ কিন্তু বদ্ধ ঘরের মধ্যে নিজের চিন্তাশক্তির দরজা খুলে দেয় এবং বিকশিত করে স্ব-স্ব প্রতিভা। কেউ লেখালেখি, কেউ সংগীত চর্চা কেউ বা নৃত্য কেউ অন্যান্য সৃষ্টিমূলক কর্মে নিজেকে পরিবৃত করে তোলে। আর এর মধ্য দিয়ে মানুষ নিজে যেমন সব বাধাকে জয় করতে পারে তেমনি অন্যকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বর্তমানে প্রযুক্তি মানুষের এই কর্মকাণ্ডে সারথির ভূমিকা পালন করে চলছে। এক কথায় মানুষ মৃত্যু ছাড়া আর কোন কিছুর সামনে থেমে থাকতে নারাজ। যদিও সত্যিকারের সৃষ্টিশীল মানুষ তা তিনি যে ক্ষেত্রেরই হোন না কেন, মৃত্যু কিন্তু তাঁকে ছিনিয়ে নিতে পারলেও তাঁর কর্মকে নিতে পারে না। তাই বাইরে যতই মৃত্যুর বিভীষিকা থাকুক সৃষ্টিশীল মানুষ কিন্তু ততই কর্মমুখর হয়ে ওঠে এবং নিজেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায়, সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় মগ্ন করে -- আর তখন সারা বিশ্ব মানুষের অন্তরে বাঁধা পড়ে যায়।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আমাদের গবেষণা পত্রিকার জন্য যাঁরা লেখা পাঠিয়েছেন, আমাদের গতিকে সচল রেখেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রাবন্ধিকদের নিজস্ব। এব্যাপারে সম্পাদক কোনভাবে দায়ি নন।

ড. মলয় দেব
বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
সূর্যমণিনগর

সূচিপত্র

অনার্য ভারতের অনুসন্ধানে ঋকবেদ	খেলন দাস হালদার	৯
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে পুরাণ : চরিত্রে ও আখ্যানে	সুচিত্রা বেরা	২১
সুধন্বা দেববর্মার 'এগিয়ে চলো' নাটক : একটি পাঠ	বিপ্লব দেববর্মা	২৬
সমরেশ বসুর গঙ্গা : মালো জীবনের আখ্যান	সৌম্যদীপ দেব	৩৪
চন্দন আনোয়ারের পোড়োবাড়ি ও মৃত্যুচিহ্নিত কণ্ঠস্বর গল্পগ্রন্থে সমাজ ও রাজনীতি	জাকিয়া রহমান	৪৭
শিশির কুমার দাশ : জ্ঞানচর্চার আলোকে (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)	সুকান্ত ঘোষ	৫৭
Three Genres in the Writing of Tripura	Bhaskar Roy Barman	৬৪
Reflection of Indigenous Society and Culture in Kokborok Proverb	Swapan Sharma	৭১
Simulkandi in Retorspect: Barman Roys and Roy Barmans at a Glance, Written by Biresh Barman Roy	Bhaskar Roy Barman	৭৬

অনার্য ভারতের অনুসন্ধানে ঋকবেদ

খেলন দাস হালদার

ভারতীয় সভ্যতা সুপ্রাচীন অনার্য সভ্যতার উত্তরসূরি। এই সভ্যতায় বহিরাগত, অর্বাচীন, আর্য সংস্কৃতির অবদান পরিমানে সামান্য। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়া থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে পশ্চিম ভারতে সিন্ধু নদের অববাহিকায় ভারতবর্ষের এক সুপ্রাচীন, সুউন্নত, সুসংস্কৃত, নগর সভ্যতার পরিচয় উদ্ভাসিত হয় যা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নতুন পথে চালিত করে। বাতিল হয়ে যায় বৈদিক সভ্যতার ঐতিহাসিক আধিপত্য। এই সভ্যতার প্রথম প্রত্নকেন্দ্র সিন্ধু নদের অববাহিকায়, হরপ্পা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় বলে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এর নামাঙ্কন করেন সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা। ইহা প্রাগার্য সভ্যতা। এই সভ্যতার কাল সম্পর্কে জানা যায়-

এই সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় ৫৩০০ বছর আগে। এর চরম উন্নতির কাল ২৬০০-২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। আর এই সভ্যতা টিকে ছিল ১৭৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত।[১]

এই সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয় ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার নয়, হরপ্পা সভ্যতার উত্তরসূরি যা ছিল প্রকৃতপক্ষে অনার্য সভ্যতা, যা গড়ে তুলেছিল মূলত দ্রাবিড় ও প্রোটো অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠী। প্রত্ন খননের ফলে আরো জানা যায় এই হরপ্পা সভ্যতা ভারতের সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল-

হরপ্পা সভ্যতা প্রাথমিকভাবে ৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে শুরু হলেও পরবর্তীকালে এই সভ্যতা ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই আফগানিস্তানের 'মুন্ডিগাক' থেকে পশ্চিমবঙ্গের 'পান্ডুরাজার ঢিবি' এবং গুজরাটের 'লোথাল' থেকে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে 'শিবালিক পাহাড়' অবধি এই বিস্তীর্ণ এলাকায় কমপক্ষে ১৭০টি জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে হরপ্পা সভ্যতা কেন্দ্র।[২]

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান নগর সমূহের মধ্যে রয়েছে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো এবং ভারতে অবস্থিত কালিবাঙ্গান, লোথাল, ধোলাবিরা, দেশলপার, আলমগীরপুর, বানওয়ালী ইত্যাদি। লোথাল

ড. খেলন দাস হালদার
সহযোগী অধ্যাপিকা,
আগরতলা

(গুজরাটে) ওসুতকাগেনদোর (পাকিস্তান ও ইরানের সীমান্তবর্তী স্থানে) ছিল তৎকালীন সময়ের নগরবন্দর। হরপ্পা সভ্যতার নগর সমূহের রাস্তাঘাট ছিল সুপরিকল্পিত ও অত্যন্ত উন্নত মানের। ঘরবাড়ি পোড়া ইট ও পাথর দিয়ে তৈরি হতো। প্রত্যেক বাড়িতে কূপ থাকত এবং বাড়ির দূষিত জল নল দিয়ে রাস্তার পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ত। সমস্ত পয়ঃপ্রণালী ঢাকা থাকত। নগরের জলের চাহিদা মেটাতে নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার নির্মাণ করত। নগরের মধ্যে ছিল উঁচু ও মজবুত প্রাকারবিশিষ্ট দূর্গ, শস্যাগার, স্নানাগার, মন্দির ও সমাধিস্থান। সীলমোহর থেকে ধারণা করা যায় হরপ্পা সভ্যতার নাগরিকেরা বহির্বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল, সীলমোহর উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনারও পরিচায়ক। উন্নতমানের নাগরিক জীবনযাপণের সমস্ত রকম আয়োজন ছিল ঐ অনার্য সভ্যতায়। ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে পশুপতি শিব ও মাতৃমূর্তি নাগরিকদের আরাধ্য ছিল। প্রতীক ও লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল। হরপ্পা সভ্যতার নগর নির্মাণরীতি ও বিশাল অঞ্চল জুড়ে সেই রীতির ঐক্য প্রমাণ করে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে স্থাপত্যবিদ্যার এবং কারিগরি বিদ্যার প্রসার ঘটেছিল এবং নাগরিকগণ এইসব বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ড. অতুল সুরও এই বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, অস্ত্রশস্ত্র থেকে আরম্ভ করে নিত্যব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্য সমূহের আকার প্রকার ও গঠন প্রণালীর ঐক্যতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।[৩]

এই উন্নত, প্রাচীন, বিশাল অঞ্চলে বিস্তৃত, ঐতিহ্যময় সভ্যতাটি বহু যুগের সাধনায় গড়ে তুলেছিল এদেশের আদিবাসী অনার্য জনসমাজ। উৎখননের ফলে উঠে এসেছে প্রচুর নরকঙ্কাল, যেগুলি ঘোষণা করে অনার্য জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব।

ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ ড. অতুল সূর তাঁর 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে হরপ্পা সভ্যতার নরকঙ্কাল তিনটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিচয়বাহী - দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠী, দেশজ প্রোটো অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠী এবং আল্পীয় আর্য জনগোষ্ঠী। ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় লোকদের আকৃতি ছিল মধ্যমাকার, এদের মস্তক দীর্ঘ, নাক ছোট ও রঙ কালো। এরা বহির্বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করত। বৈদিক সাহিত্যে এরা 'পণি' এবং এদের মধ্যে যারা বাণিজ্যে যুক্ত ছিল না কিন্তু শক্তিশালী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, ক্ষমতাবান ও বিত্তবান ছিল, তারা রাক্ষস, দস্যু ইত্যাদি নামে অভিহিত ছিল। প্রোটো অস্ট্রালয়েডরা ছিল খর্বকায়, মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল ঢেউ খেলানো। বৈদিক সাহিত্যে এরা দাস, দস্যু, নিষাদ ইত্যাদি নামে অভিহিত।

আল্পীয় আর্যরা ছিল হ্রস্ব কপাল বিশিষ্ট, মাথার খুলি বৈদিক আর্যদের তুলনায় ছোট ও চওড়া, মুখ গোল ও গায়ের রঙ ফর্সা, নাক তীক্ষ্ণ ও লম্বা।

প্রাচীন সাহিত্যে এরা অসুর নামে অভিহিত। আর্যদের আদি বাসস্থান ও পরিযান সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পন্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূ-খণ্ড ছিল আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান। কালক্রমে তথাকার আর্যরা আল্পীয় ও নর্ডিক নামক দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আল্পীয়রা ছিল কৃষিপরায়ণ ও অসুর উপাসক, অপরপক্ষে নর্ডিকরা পশুপালক ও দেব উপাসক। দুটি গোষ্ঠীই কিছুটা সময় আগে-পরে, আনুমানিক খ্রী. পূর্ব ২০০০ অব্দের পর থেকে ক্রমান্বয়ে দলে দলে পৃথীবীর বিভিন্ন দিকে পরিযান শুরু করে। হয়তো তাদের নিজদেশের পরিবেশ-প্রকৃতি- জলবায়ু জীবন ধারণের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠায় সুবিধাজনক বাসস্থান অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পরিযানে বাধ্য হয়েছিল।

পরিযানরত এশিয়া অভিমুখী আল্পীয় শাখাটি একসময় ইরাণ ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। এদেরই একটা অংশ ইরাণ থেকে সম্ভত জলপথেই, সুতকাগেনদোর ও লোথাল নগরবন্দর দিয়ে পশ্চিম ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদদের মতানুসারে ঐ আল্পীয় আর্যদের একদল ভারতের পশ্চিম উপকূল অঞ্চল ধরে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং আরেকদল পূর্ব উপকূল ধরে বাংলা ও ওড়িশায় পৌঁছায়। এভাবে এইসব অঞ্চলে অসুর জাতি ছড়িয়ে পড়ে।

আল্পীয়দের পশ্চিম ভারতে অনুপ্রবেশ কালে দ্রাবিড় ও অস্ট্রালয়েডদের মিলিত শক্তি অতীব সক্রিয় ছিল। হয়ত আল্পীয়রা প্রাথমিকভাবে সংগ্রামের প্রয়াস করে ব্যর্থ হয়ে পরে সন্ধি বা আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল। কৃষিপরায়ণ আল্পীয় আর্যদের মানসিকতাও হয়তো মূলত কৃষিজীবী অনার্যদের সঙ্গে সমন্বয়ে সহায়ক হয়েছিল।

অনার্য মানস স্বভাবত সরল, স্নেহপ্রবণ অতিথিবৎসল, উদার, দানশীল ও ক্ষমাপ্রবণ। আল্পীয় আর্যদের তারা গ্রহণ করেছিল। সংগ্রামশীল, আগ্রাসী নর্ডিক তথা বৈদিক আর্যরা পরবর্তীকালে এসেছিল। এই বিষয়ে পণ্ডিতদের অভিমত –

পণ্ডিতদের মতে, এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে শেষোক্তরা পরবর্তীকালে বৈদিক আর্য হিসেবে পরিচিত হয়েছিল , কিন্তু প্রথমোক্তরা পূর্বেই ইরাণ থেকে অল্প সংখ্যায় ভারতবর্ষে এসে শান্তিপূর্ণভাবে প্রাগার্যদের মধ্যে মিশে গিয়ে আর্যাবর্তে বসতি স্থাপন করেছিল।[৪]

বহিরাগত আর্যরা এদেশে একবারে আসেনি, সময়ান্তরে একটির পর একটি দলে এসেছিল। ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

আর্যরা ভারতবর্ষে একবারে আসেনি, দলে দলে, বারে বারে এসেছিল।

তাদের মধ্যে একটি দলই বেদ বহন করে এনেছিল - সেটিই ছিল শেষ বৃহৎ দল।[৫]

পূর্বাগত অসুর পূজক কৃষিপ্রধান আল্পীয় আর্যরা হরপ্পীয় অনার্যদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সমর্থ হয়েছিল। হরপ্পা সভ্যতায় এই জনগোষ্ঠীর মানুষের কিছু সংখ্যক নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। কিন্তু আর্যদের মূলবাহন অশ্বের অস্থি মেলেনি। তাই ধারণা করা হয় তারা ইরাণ থেকে জলপথেই পশ্চিম ভারত দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছিল। পরবর্তীকালে দেবোপাসক, পশুপালক,অশ্ববাহী নর্ডিক আর্য জনগোষ্ঠী তাদের আদি বাসস্থান থেকে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি পশ্চিম ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় এবং এশিয়ামুখী অপর শাখাটি ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশের গিরিপথ ধরে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করে। এরাই বৈদিক আর্য। ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় এরা অবিরাম দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করেছিল দুর্গ ও প্রাকারবেষ্টিত নগর সমূহের অনার্য আদিবাসীদের সঙ্গে। এই নগর সমূহ ছিল সিন্ধুসভ্যতার নগর এবং অনার্যরা ছিল প্রাগার্য ভারতীয় বা হরপ্পীয়গণ। সুদীর্ঘকালের সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত বহিরাগত নর্ডিক আর্যরা জয়ী হয়েছিল এবং ধ্বংস করেছিল পাঁচ হাজার বছর আগে গড়ে উঠা এক সমুন্নত, সুসংস্কৃত অনার্য সভ্যতা। খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ অব্দ নাগাদ আর্যরা সিন্ধু অঞ্চলে আক্রমণ চালায় । হরপ্পা সভ্যতার বিনাশ শুরু হয়ে যায় এবং ৩০০ বছরের মধ্যেই তারা আর্যাবর্তের অনেকটা নিজেদের অধিকারে আনে।[৬]

ভারতে আর্যদের বসতি স্থাপনের অধ্যায়টি সহজ ছিল না, স্বল্পকালীনও না। কয়েকশত বৎসর ধরে প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চলছিল তাদের ভূমি দখলের লড়াই। এতটা সময় ধরে যে প্রাগার্য বীর যোদ্ধাগণ একটা বহিরাগত, যাযাবর, সংগ্রামশীল, হিংস্র, আগ্রাসী, অশ্বারোহী, বিদেশ থেকে সরবরাহকৃত উন্নতমানের অস্ত্রসমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংগ্রাম জারি রেখে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জীবন দিচ্ছিল তাদের শৌর্য-বীর্য এবং দেশপ্রেম ছিল নিশ্চয় অসাধারণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্যদের লৌহ নির্মিত বজ্র এবং অশ্বচালিত দ্রুতগামী যুদ্ধরথ অনার্যদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর্যদের শকট ছিল বলদ চালিত এবং শকটের চক্র কাষ্ঠনির্মিত, ফলত ধীরগামী। তারা ব্যবহার করত তামার অস্ত্র যার দৃঢ়তা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। দীর্ঘকাল তারা এইসব যুদ্ধ সামগ্রী দ্বারা দেশপ্রেম, মনোবল ও শক্তিমত্তার সঙ্গে সংগ্রাম জারি রেখেছিল। প্রথম পর্বে আর্যরা জয়ের মুখ দেখতে পায়নি। পাহাড় জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে অতিকষ্টে অন্নাভাবে, জলাভাবে, নিরাশ্রয় নিরন্ন জীবনযাপন করত ও সুযোগ মতো অনার্যদের উপর আক্রমণ করত, অন্ন ও গোসম্পদ লুণ্ঠন করত। তাই দরিদ্র, হাভাতে আর্যদের অন্নকামনা, জলকামনা, গোধন কামনার প্রচুর পরিচয় রয়েছে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদ থেকে এই জাতীয় একটি ঋকের পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল-

হে ইন্দ্র! এ দীপ্ত হব্যসমূহ ও এ সোমরস সমূহে তুষ্ট হয়ে গো এবং অশ্বযুক্ত ধন দান করে আমাদের দারিদ্র দূর করে প্রসন্নমনা হও। এ সোমরসে তুষ্ট ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা দস্যুকে ধ্বংস করে এবং শত্রু হতে মুক্তি লাভ করে সম্যক রূপে অন্ন ভোগ করব।[৭]

বৈদিক আর্যরা ভারতে অনুপ্রবেশ কালে হরপ্পীয় অনার্যদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। অনার্যরা ছিল তাদের মহাশত্রু। শঙ্কাপূর্ণ চিত্তে আর্যরা অনার্যদের 'দস্যু' নামে অভিহিত করে তাদের মনের হিংসা, ঘৃণা, ভয় ও শত্রুতা প্রকাশ করত। বিদেশ থেকে এসে অপরের গড়া দেশ, অপরের অর্জিত সম্পদ যারা বলপূর্বক দখল করতে চায়, দস্যু তারাই। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে আর্য দস্যুরা যাদের উপর দস্যুতা করেছে সেই অনার্যদের দস্যু বলে অভিহিত করে চিত্তদাহ প্রকাশ করেছে। তবে ঋকটিতে আর্যদের শত্রুভয় তথা অনার্য ভয় এবং দারিদ্র ও অন্নাভাব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম পর্বের সংগ্রামে যে প্রবল প্রতাপশালী অনার্য বীরদের সঙ্গে আর্যরা এঁটে উঠতে পারত না সেই সত্য কিন্তু ঋক বেদের এই ধরনের বিভিন্ন শ্লোকে লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

'হে ইন্দ্র! যে সকল লোক সোমাভিষব করে না এবং যাদের নাশ করা দুঃসাধ্য তাদের হত্যা কর, যেহেতু তারা তোমার সুখের জন্য নয়। ওদের ধন আমাদের দাও, তোমার স্তোতাই ধন প্রাপ্ত হয়।' [৮]

'হে ইন্দ্র ! আমরা তোমাকে সহায় লাভ করে, যে শত্রুগণ আপনাদের অবধ্য বলে মনে করছে, তাদের বিনাশ করব। তুমি আমাদের ত্রাতা এবং আমাদের ধনবর্ধক হও। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।'[৯] 'হে ইন্দ্র ! যারা ধনে, যুদ্ধে, বীরসমূহে আমাদের অভিমানী শত্রু তাদের পরাজয় কর।' [১০]

আর্যরা এদেশে অনুপ্রবেশ করার পর যে শক্তিশালী বীর অনার্য যোদ্ধাদের সম্মুখীন হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল তা কিন্তু এখানে ('নাশ করা দুঃসাধ্য', 'শত্রুগণ আপনাদের অবধ্য' 'যারা ধনে, যুদ্ধে, বীরসমূহে আমাদের অভিমানী শত্রু' এইসব কথনে) স্পষ্ট। নিরুপায় হয়ে আর্যরা ভারতে অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য দূরদেশে অবস্থানরত ইন্দ্রকে কাতরভাবে আহ্বান করত - 'হে ইন্দ্র ! তুমি অন্নলাভকর যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।'[১১]

বোঝা যাচ্ছে ভারতের মাটি দখলের লড়াইয়ে অসমর্থ, বিপদগ্রস্ত আর্যদের শেষ ভরসা ছিল ইন্দ্র। অন্তিমপর্বের সংগ্রামে আর্যদের বিজয় মূলত ইন্দ্রের অবদান, এ ছাড়া ছিল বিশেষ কিছু কারণ, যেমন আর্যদের কূটবুদ্ধি, অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়ার প্রয়াস, অসুরদের সহায়তালাভ, বাইরের দেশ থেকে

(ইরাণ, মিট্টানি ইত্যাদি) অস্ত্র শস্ত্র, অর্থ-সম্পদ তথা যুদ্ধ সরঞ্জাম, সেনা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বলবান সেনাপতি সরবরাহ ইত্যাদি।

বহিরাগত আর্য সেনাপতির সাধারণ নাম ছিল ইন্দ্র। ইন্দ্র ছিলেন আর্যদের যাবতীয় জাগতিক চাহিদার পূরক। অভিভাবক সদৃশ চাহিদাপূরক এই আর্য নেতাটি ভক্তদের চাহিদাপূরণে সকল প্রকার ন্যায় নীতি বিসর্জন দিতেন। নরহত্যা, নারীহত্যা, দস্যুতা, হিংস্রতা, লুণ্ঠন ইত্যাদি কুকর্ম করতেন গৌরবের মত্ততায়। এই জাতীয় কর্মের জন্যই সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়ে রয়েছে তাঁর প্রতি আর্যভক্তদের স্তুতি, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। যেমন-

ভূরিকর্মা, দেবশ্রেষ্ঠ, অভীষ্টদাতা, সত্যবল, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমরা সোম অভিযান করি ; পথনিরোধক চোর যেরূপ পথিকের নিকট হতে ধন কেড়ে নেয়, শূর ইন্দ্র সেরূপ ধনের আদর করে যজ্ঞবিহীন লোকদের নিকট হতে সে ধন ভাগ করে নিয়ে যজ্ঞপরায়ণদের নিকট তা দান করতে গমন করেন।[১২]

দস্যুতা তথা ডাকাতি ও লুণ্ঠনের মতো প্রিয়কর্ম দ্বারা ইন্দ্র আর্যদের নিকট স্তুতিভাজন হয়ে উঠেছিলেন সেই পরিচয় রয়েছে ঋকটিতে। ইন্দ্র যে বিপন্ন আর্যদের আহ্বানে তাদের রক্ষা করতে দূর দেশ থেকে ছুটে আসতেন তার পরিচয় রয়েছে বিভিন্ন ঋকে। যেমন –

হে ইন্দ্র ! তুমি রাক্ষসশূন্য, পাপরহিত পথে প্রচুর ধন নিয়ে আমাদের নিকট এস। হে ইন্দ্র ! তুমি দূরদেশ ও নিকট হতে এসে আমাদের সাথে মিলিত হও। তুমি দূরদেশ ও নিকট হতে যাগ নির্বাহের অভিপ্রায়ে আমাদের রক্ষা কর। যজ্ঞ নির্বাহ করে সর্বথা আমাদের পালন কর। [১৩]

হে ইন্দ্র ! রাক্ষসকুল সমূলে উৎপাটন কর, মধ্যভাগ ছেদন কর, অগ্রভাগ বিনাশ কর। গমনশীল রাক্ষসকে দূর কর, যজ্ঞবিদ্বেষীর প্রতি সন্তাপপ্রদ অস্ত্র প্রক্ষেপ কর। [১৪]

যজ্ঞপরায়ণ আর্যরা ভিন্নধর্মী, যজ্ঞহীন অনার্যদের বিনাশ করে তাদের জমি, ভূমি, সম্পদ দখল করার জন্য ধর্মের দোহাই দিয়ে আর্যযোদ্ধা উগ্র ইন্দ্রকে কাতর প্রার্থনা করে ডেকে আনত। তবে বজ্রধারী ইন্দ্রের পক্ষেও কঠিন ছিল অনার্যবীরদের সঙ্গে সংগ্রাম। কখনো কখনো ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ে পলায়ন করেছে। যেমন –

হে ইন্দ্র ! অহিকে হনন করবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হয়েছিল ,তখন তুমি অহির অন্য কোন হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করছিলে, যে ভীত হয়ে শ্যান পক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী পার হয়ে গিয়েছিলে? [১৫]

শেষপর্যন্ত বজ্রধারী ইন্দ্রের নেতৃত্বে আর্যরা বিজয়ী হয়েছিল। দ্রুতগামী বলবান অশ্ব, দৃঢ় মজবুত যুদ্ধরথ এবং লৌহ নির্মিত অস্ত্র সম্ভবত ইন্দ্র সংগ্রহ করেছিল মিট্টানি রাজ্য ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে। মিট্টানি রাজ্যটি গড়ে

উঠেছিল উত্তর সিরিয়ায়। এই প্রসঙ্গে ভাষাতত্ত্ববিদ পরেশ ভট্টাচার্যের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ;

মূল আর্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর যে ধারাটি কালক্রমে ভারতবর্ষে উপনীত হয়েছিল , সেটি তৎপূর্বে বেশ অনেক কাল মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে পুষ্টিলাভ করেছিল। তৎকালে ঐ অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকায় আর্যভাষী মিট্টানিদের রাজত্ব ছিল – মিট্টানিদের ভাষাতেই ভারতীয় আর্যভাষার আদিরূপটি বিধৃত রয়েছে – এই রূপভেদটিকেই ' মিট্টানি ভারতীয় আর্য' নামে অভিহিত করা হচ্ছে। [১৬]

ইরাণীয় আর্য ও মিট্টানি আর্য ভাষার মধ্যে ভাষাবিদগণের মতে, মিট্টানির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের রয়েছে অধিক সাযুজ্য। নাসত্য, সত্য, সু ইত্যাদি শব্দে সংস্কৃত এবং মিট্টানিতে একক 'স' বর্তমান, কিন্তু ইরাণীতে তা 'হ' তে রূপান্তরিত। সর্বোপরি বৈদিক পূজ্য দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য প্রমুখ মিট্টানিতেও পরিচিত ও পূজ্য, কিন্তু ইরাণে ইন্দ্র, নাসত্য তাদের মর্যাদা হারিয়েছেন। মিট্টানিদের রাজত্বকাল ছিল খ্রী. পূর্ব ১৫০০ – খ্রী. পূর্ব ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত। এদের সম্পর্কে আরো জানা যায় –

Mittani was one of the several kingdoms and small states (another being hurri) founded by the Indo – Iranian in Mesopotemia and Syria. Although originally these Indo – Iranians were probably members of Aryan tribes that later settled in India, they apparently broke off from the main tribe on the way and migrated to Mesopotemia instead. There they settled among the Hurrian peoples and soon became the ruling noble class, called maryannu. [17]

এই মিট্টানি আর্যরা অশ্বচালনা ও অশ্বচালিত দ্রুতগামী, হালকা কিন্তু মজবুত, দৃঢ় যুদ্ধরথ নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করেছিল।

The Mittani were famed horsemen and charioteers. It is recorded that they were the innovators who spearheaded the development of the light war chariots with wheels that used spokes rather than the solid wood wheels, such as those used by the Sumerians, so that the chariots were faster and easier to maneuver. [18]

ধারণা করা যায় ইন্দ্র যে ভারতে অনার্যদের সঙ্গে সংগ্রামরত আর্যদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দূরদেশ থেকে যুদ্ধসরঞ্জাম সমৃদ্ধ হয়ে ছুটে এসে সহায়তা প্রদান করতেন, তার উৎস ছিল ঐসব আর্য সম্পর্কিত অঞ্চল। ঋকবেদে আর্যদের বলতে শোনা যায় ;

হে শতক্রতু ! নিকট অথবা দূরদেশ হতে আমাদের অভিমুখে এস। হে বজ্রবান ইন্দ্র ! তোমার যে উৎকৃষ্ট স্থান আছে সেখান হতে এ যজ্ঞে এস।[১৯]

তিনি দূরদেশ থেকে তথা উৎকৃষ্ট স্থান থেকে এসে আর্যদের জন্য কি কার্য সিদ্ধি করতেন?

তিনি বজ্ররূপ অস্ত্র নিয়ে বীরকার্যে উৎসাহ পূর্ণ হয়ে, দস্যুদের নগরসমূহ বিনাশ করে বিচরণ করেছিলেন। হে বজ্রধারিন ! আমাদের স্তুতি অবগত হয়ে দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর ; হে ইন্দ্র ! আর্যগণের বল ও যশ বর্ধন কর। [২০]

অনার্য শত্রুদের বিনাশ এবং আর্যদের সম্পদ ও শক্তি লাভের প্রার্থনায় পরিপূর্ণ সমগ্র ঋকবেদ।

অন্তিম সংগ্রামে তথা আর্য-অনার্যের শেষ মহাসংগ্রামে বজ্রধারিন ইন্দ্রের সহায়তায় আর্যরা বিজয়লাভ করেছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিল অনার্য হরপ্পীয়দের শত শত বৎসরের সাধনায় গড়ে তোলা ঐতিহ্যবাহী নগর, সভ্যতা, সংস্কৃতিকে - পুরভেদী, মহিমাসূচক ধনযুক্ত ইন্দ্র, শত্রুদের হিংসা করে তেজ দ্বারা দাসকে জয় করেছেন ! স্তোত্র দ্বারা আকৃষ্ট, বর্ধিত শরীর ও বহু অস্ত্রধারী ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ করেছেন। [২১]

হে ইন্দ্র ! তুমি শত্রুধর্ষণকারী রূপে যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বল দ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর। হে ইন্দ্র ! তুমি নমি ঋষির সহায়ে দূর দেশে নমুচি নামক মায়াবীকে বধ করেছিলে। [২২]

হে ইন্দ্র ! তুমি শত্রু নিহন্তা, তুমি প্রশংসনীয় কার্য সম্পাদন করেছ, কারণ হে বীর ! তুমি শত শত ও সহস্র সহস্র শম্বর সৈন্য বিদারিত করেছ।[২৩]

ইন্দ্র দভীতিতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যক দাসকে হনন করে প্রসুপ্ত করেছিলেন।[২৪]

ইন্দ্র তাঁর লৌহাস্ত্র বজ্রের দ্বারা শত সহস্র অনার্য যোদ্ধাদের নিহত করেছিলেন, ঋকবেদে রয়েছে যার গর্বিত প্রকাশ। এরপরও এমন কোন কোন অনার্য বীরযোদ্ধা ছিলেন যাদের সঙ্গে ইন্দ্র যুদ্ধে জয়ী হতে পারছিলেন না, যেমন 'কৃষ্ণ' নামক এক বীর যোদ্ধার কথা আছে কয়েকটি সূক্তে যার একটিতে কৃষ্ণের প্রতি হিংসার বশবর্তী ইন্দ্র কর্তৃক গর্ভবতী স্ত্রী হত্যার মতো হীন বর্বরোচিত কর্মের প্রশংসা ও স্তুতি করা হয়েছে উল্লাসের সহিত --

যিনি ঋজিশ্বন রাজার সঙ্গে কৃষ্ণের গর্ভবতী ভার্যাদের হত করেছিলেন, সে ঋষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নের সঙ্গে স্তুতি অর্পণ কর। আমরা রক্ষণেচ্ছায় সে অভীষ্টদাতা, দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্রকে মরুৎগণের সাথে আমাদের সখা হবার জন্য আহবান করি। [২৫]

অনার্যদের সঙ্গে শত্রুতা ও অনার্যদেশ দখল করার লোভে যুদ্ধলিপ্ত

বর্বর আর্যরা নারীহত্যা, শিশুহত্যা এমনকি গর্ভস্থ শিশুহত্যা করতেও পিছপা হয়নি। আর্যদের পক্ষে স্বার্থসিদ্ধি মূলক এই জাতীয় দুষ্কর্মের জন্যই ইন্দ্র ছিলেন বন্দিত।

তিনি অনেকের দ্বারা আহুত হয়ে এবং গমনশীল মরুৎগণের দ্বারা যুক্ত হয়ে পৃথিবী নিবাসী দস্যু ও সিম্যুদের (রাক্ষস) প্রহার করে হননকারী বজ্র দ্বারা বধ করলেন, পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদের সাথে ক্ষেত্র ভাগ করে নিলেন, শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য এবং জল সমুদয় প্রাপ্ত হলেন। [২৬]

এখানে ইন্দ্রের নেতৃত্বে কৃষ্ণবর্ণের অনার্যবিজয়, নগরবিনাশ ও শ্বেতবর্ণ আর্যদের ক্ষেত্র দখলের কথা স্পষ্ট উল্লেখিত। এরপর চলে বিজয় উল্লাসে ইন্দ্র স্তুতি ও বিজয় উৎসবের আয়োজন –

ধনজয়ী, স্বর্গজয়ী, সদাজয়ী, মনুষ্যজয়ী, উর্বর ভূমি বিজয়ী, অশ্ববিজয়ী, গোবিজয়ী, জলবিজয়ী, অতএব সর্ববিজয়ী যজনীয় ইন্দ্রের উদ্দেশে স্পৃহনীয় সোম আহরণ কর।[২৭]

হরপ্পীয়দের সঙ্গে অন্তিম সংগ্রামে অসুর গোষ্ঠী তথা আল্পীয় আর্যদের একটা অংশ সম্ভবত আর্যদলে যোগ দিয়েছিল। হয়ত ঐ 'বিভীষণ দল' অনার্যদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আর্যদের গোপনে ভেতরের খবর সরবরাহ দ্বারা স্বার্থকেন্দ্রিক মিত্রতা স্থাপন করেছিল। আল্পীয় ও নর্ডিকরা মূলত একই ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশজাত। পরবর্তীকালে জীবনাদর্শে ব্যতিক্রম ঘটলেও সহোদরের সম্পর্ক বহমান ছিল। মাঝে মাঝে চলত তাদের মধ্যে দখলদারির লড়াই। যেমন পুরাণে বর্ণিত দেবাসুরের ত্রিভুবন তথা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল (আর্যদের সুখময় বাসস্থান/ইলাবৃতবর্ষ - আর্য অধিকৃত উত্তর ভারত/আর্যাবর্ত - সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল) দখলের লড়াই। আবার স্বার্থ আদায়ে সম্মিলিত কর্ম-উদ্যোগ, যেমন সমুদ্র মন্থন, যদিও সে।

আর্য-অনার্যের অন্তিম সংগ্রামে আর্যদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভবত স্বার্থভিত্তিক চুক্তি হয়। নর্ডিক ও আল্পীয় গোষ্ঠী থেকেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণি সৃষ্টি হয় , যারা সম্মিলিতভাবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা আগলে রাখে। দ্রাবিড়দের মধ্যে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করত, অর্থ সরবরাহের খাতিরে তাদের বৈশ্য অবস্থানে রাখে। অবশিষ্ট দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর জনসমুদায়কে রাক্ষস, দস্যু, শূদ্র/দাস, চণ্ডাল ইত্যাদি অবনত অবস্থানে অবনমিত করে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত অধিকার কেড়ে নিয়ে অপর তিন বর্ণের সেবায় বাধ্য রেখে, তাদের শ্রম শোষণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিল বিজয়ী আর্যরা। বিজিত অনার্য জাতি ক্ষমতাকেন্দ্রিক সকল অধিকার হারিয়ে সংখ্যায় অধিক হয়েও অসহায় মানবেতর জীবন যাপণে বাধ্য হয়েছিল। এই প্রসঙ্গের উল্লসিত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ঋক বেদে –

হে মনুষ্যগণ ! যিনি এসমস্ত নশ্বর বিশ্ব নির্মাণ করেছেন, যিনি দাস বর্ণকে নিকৃষ্ট এবং গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করেছেন, যিনি লক্ষ্য জয় করে ব্যাধের ন্যায় শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। [২৮]

বিজয়ী আর্যরা বিজিত অনার্যদের নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থাপিত করে নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ কায়েম রাখার জন্য সৃষ্টি করেছিল জাতিগত বিভেদমূলক, শোষণমূলক, বঞ্চনামূলক সমাজব্যবস্থা। স্মৃতি, শাস্ত্র, পুরাণ দ্বারা অনার্যদের প্রতি ছড়িয়ে দিয়েছিল তীব্র ঘৃণার আবহ। তাদের আত্ম-উন্নয়নের পথকে কঠোরভাবে করেছিল রুদ্ধ, যার পরিচয় রয়েছে রামায়ণে, তপস্যাকারী শম্বুক নিধন কাহিনির মধ্যে, মহাভারতে একলব্যের অস্ত্র সাধনাকে ব্যর্থ করে দেয়ার মধ্যে। তারপরও যাদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে বেগ পেতে হতো, তাদের অবদমিত করতে বন্ধুত্বের নামে করত সমঝোতা, যেমন রামায়ণে চণ্ডালরাজ গুহকের সঙ্গে রামের মিত্রতা। ব্রাহ্মণের হিংসাপ্রসূত অগ্নিচক্ষু এবং ক্ষত্রিয়ের স্বার্থপ্রসূত, হিংস্র রক্তক্ষয়ী হাত ছারখার করে দিত উন্নয়নকামী অনার্য-জীবন। বিদেশী এবং বহিরাগত ছিল বলেই আত্মস্বার্থ কায়েম রাখতে এই দেশের মানুষের মধ্যে এমন বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা পত্তন করেছিল আর্যরা যার প্রভাব সমাজে কমবেশি আজও রয়ে গেছে। অনার্যদের ভূমি, ধন-সম্পদ, গৃহ, নগর, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, কৃষিপদ্ধতি, স্থাপত্যবিদ্যা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র সবকিছু জবরদখল করে নিজেদের লেবেল তথা আর্য ব্র্যান্ড এর ছাপ লাগিয়েছে বহিরাগতরা, হয়ে উঠেছে প্রভু। আর নিজগৃহে অনার্যরা হয়েছে পরবাসী, মানবিক অধিকারহীন, অপমানিত, রিক্ত, অন্ত্যজ, শুদ্র, দাস। এখানেই ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের ট্র্যাজেডি। ঋক বেদে আর্য-অনার্য যুদ্ধ প্রসঙ্গে বহু অনার্য বীরের উল্লেখ আছে যারা গড়েছিল উন্নত নগর সভ্যতা। যেমন পিপ্রু, নমুচি, করঞ্জ, পর্ণয়, অংহা, বঙ্গৃদ, কৃষ্ণ, বৃত্র, শম্বর, প্রমুখ আরো অনেকে। ধ্বংশ হয়েছিল তাদের বহুকালের জীবন সাধনায় গড়ে তোলা নগর, লুণ্ঠিত হয়েছিল তাদের সম্পদ ও নারী, নিহত হয়েছিল তারা আর্য আক্রমণে। ইন্দ্রের নেতৃত্বে আর্যরা যে নগর সভ্যতার বিনাশ করেছিল তা হরপ্পীয় সভ্যতা হওয়াই সম্ভব। ষষ্ঠ মণ্ডলের ২৭ তম সূক্তে আছে –

ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যবর্তীর প্রতি অনুকূল হয়ে বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করেছেন। তিনি হরিযুপীয়ার (হরাপ্পা?) পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখের পুত্র বৃচীবানের বংশধরদের বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত বরশিখের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়েছিল। [২৯]

এই হরিযুপীয়ার কি হরপ্পার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে না ? আর্য আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল হরপ্পা সভ্যতা। বীর, সংস্কৃতিবান, নগরসভ্যতার বাহক অনার্যরা ভারতের ইতিহাসে স্থান পেল না। হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে রইল তাদের গৌরবের ইতিহাস। তবে ভারতের ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা

সংস্কৃতির যে ধারা প্রবাহিত তা বাইরে আর্য লেবেল সাঁটা অনার্য সংস্কৃতিই। আর্য অবদান তাতে সামান্যই। তবে উপাদান বৃহৎ, যেমন জাতিভেদমূলক, বৈষম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা, যা ভারতবর্ষকে ক্রমাগত পেছনে ঠেলেছে। কবিগুরুর ভাষায়, 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে'।

অনার্য ভারতের যোগ্য কৃতি সন্তান বাবাসাহেব আম্বেদকর সংবিধানের ডিনামাইট দিয়ে যুগ যুগান্তের সামাজিক অন্যায়ের পাহাড় গুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু আজকের দিনেও বহু মানুষের মনে জঞ্জালের মতো জাতিবিদ্বেষের আবর্জনা জমে আছে যা ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ খুঁজে তারা অহরহ। তারা জানেনা অনার্য ইতিহাস, অনার্য মহিমা। জানেনা বহিরাগত আগ্রাসী আর্য কর্তৃক অনার্য দেশ, ভূমি, নগর, সম্পদ, নারী, গোধন লুণ্ঠন ও আত্মসাতের ইতিহাস যা ঋক বেদের পাতায় পাতায় মুদ্রিত আছে। ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়ে ঋক বেদ পড়লে লাভ করা যায় আবিষ্কারের আনন্দ। যেহেতু অনার্য ইতিহাসের লিখিত রূপ নেই, কিংবা যা আছে যেমন সিন্ধুলিপি কিন্তু অর্থ উদ্ধার হয়নি এখনো তাই অনার্য ইতিহাস অন্বেষণের ও অনার্য মহিমা অনুধাবনের একটা বিশেষ ক্ষেত্র ঋক বেদ। অবশ্যই আর্য আসক্তির চশমা-চোখে নয়, নিরপেক্ষ মানবিক দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করতে হবে।

তথ্য সূত্র :

১। হরপ্পার অনার্য গরিমা, ২০০৪, প্রশান্ত প্রামাণিক, জ্ঞানবিচিত্রা, আগরতলা পৃ. ১৮৭

২। তদেব : ১৮৭-৮৮

৩। অতুল সূর, হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৩০

৪। সুকুমারী ভট্টাচার্য, ২০১৭, প্রবন্ধ সংগ্রহ – ৪, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ. ১৫

৫। সুকুমারী ভট্টাচার্য, ২০১৭, প্রবন্ধ সংগ্রহ – ২, পৃ. ১৭

৬। হরপ্পার অনার্য গরিমা, ২০০৪, প্রশান্ত প্রামাণিক, জ্ঞানবিচিত্রা, আগরতলা, পৃ. ৯৮

৭। বেদ, প্রথম খণ্ড, রমেশ চন্দ্র দত্ত (অনুবাদক), হরফ প্রকাশনী,পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ.

৮। তদেব : ১/১৭৬/৪ পৃ. ১৮

৯। তদেব : ১/১৭৮/৫ পৃ. ৩১৯

১০। তদেব : ৩/৩৭/৭ পৃ. ৪৩৫

১১। তদেব : ৩/৩৬/১১ পৃ. ৪৩৪
১২। তদেব : ১/১০৩/৬ পৃ. ২০৯
১৩। তদেব : ১/১২৯/৯ পৃ. ২৫৭
১৪। তদেব : ৩/৩০/১৭ পৃ. ৪২২
১৫। তদেব : ১/৩২/১৪ পৃ. ১১৮
১৬। ভাষাবিদ্যা পরিচয়, পরেশ ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০১৭, কলকাতা – ৭০০০০৯, পৃ . ৭১
১৭। https://www.britanica.com.place.
১৮। https://www.ancient.cu.mitanni.
১৯। বেদ, প্রথম খণ্ড, ৩/৩৭/১১ রমেশ চন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে, হরফ প্রকাশনী, পূনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ৪৩৫
২০। তদেব : ১/১০৩/৩ পৃ. ২০৯
২১। তদেব : ৩/৩৪/১ পৃ. ৪৩১
২২। তদেব : ১/৫৩/৭ পৃ. ১৪৯
২৩। তদেব : ৬/২৬/৫ পৃ. ৩৪
২৪। তদেব : ৪/৩০/২১
২৫। তদেব : ১/১০১/১
২৬। তদেব : ১/১০০/১৮ ২০৪
২৭। তদেব : ২/২১/১ ৩৬০
২৮। তদেব : ২/১২/৪ ৩৪৮
২৯। তদেব : ৬//২৭/৫ পৃ. ৩৫

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে পুরাণ : চরিত্রে ও আখ্যানে

সুচিত্রা বেরা

বাংলাদেশে আনুমানিক খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক এবং পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক যেসব ধর্ম-বিষয়ক আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে মঙ্গলকাব্য বলা হয়।

মঙ্গলকাব্যের দুটি ধারা : পৌরাণিক ও লৌকিক।

পৌরাণিক : সূর্য-মঙ্গল, ভবানী-মঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, চণ্ডিকা-মঙ্গল ইত্যাদি।

লৌকিক : শিবায়ন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যগুলি ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনায় দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য রচিত হলেও এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলার লৌকিক ধর্মের ওপর একটা পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপ করা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখছেন:

"প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে লৌকিক দেবতারই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে কিন্তু পরবর্তী মঙলকাব্যগুলিতে সংস্কৃত পুরাণোক্ত দেবতারা আসিয়া লৌকিক দেবতাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি মৌলিকতা বর্জিত এবং সংস্কৃত পুরাণগুলিরই অন্ধ অনুকৃতি মাত্র"[১]।

মুসলমান-প্রভাবিত হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার চেষ্টায় এই মঙ্গলকাব্যগুলি সংস্কৃত পুরাণের আদলে রচিত হয়েছিল। কিন্তু পুরাণের প্রভাবে এই কাব্যসমূহের দেব-দেবীর চরিত্রে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। পৌরাণিক দেব-দেবী এখানে লৌকিকতার স্তরে নেমে এসেছে। এখানে ভবানন্দ ছাড়া প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গই সংস্কৃত অর্বাচীন পুরাণ থেকে গৃহীত। কিন্তু এর চরিত্রগুলি বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া এবং দেব-দেবীরা স্বর্গীয় মহিমা ত্যাগ করে সাধারণ নর-নারীতে পরিণত হয়েছে। ফলে মহাদেব, অন্নপূর্ণা, ব্যাসদেব চরিত্রগুলিতে প্রাচীন ধ্রুপদী ও পৌরাণিক ঐতিহ্য রক্ষিত হয়নি।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যগুলিকে 'দেবখণ্ড' ও 'নরখণ্ড' নামক দুটি সুস্পষ্ট খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। 'দেবখণ্ড' পুরাণ আশ্রিত এবং 'নরখণ্ড' হচ্ছে কাব্য। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে পুরাণ ও কাব্য পরস্পর নিজস্ব স্বতন্ত্রতা

সুচিত্রা বেরা
গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়ে স্থান লাভ করেছে। সুতরাং, বোঝাই যায় যে দেবখণ্ডকে পুরাণের কাহিনিতে রূপান্তর করা একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ভারতচন্দ্র নিজেই বলছেন :

"ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলংকার সংগীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী"।[২]

বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগ বলা যেতে পারে। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এই সময়েরই কবি।

ভারতচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা। অন্নদামঙ্গল পৌরাণিক ছাঁদে রচিত হলেও এতে বাস্তব বঙ্গীয় সমাজ এবং মানুষের ছবি ফুটে উঠেছে।

"ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে" _____ সে গুণ হল অন্নদামঙ্গলে অন্তর্ভুক্ত পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত তিনটি কাব্য : (ক) 'অন্নদামঙ্গল' (খ) 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' বা 'মানসিংহ' এবং (গ) 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর'।

এই কাব্যের প্রথম খণ্ডে অর্থাৎ 'অন্নদামঙ্গল'-এ বাংলার ঐতিহাসিক পরিবেশ অঙ্কিত হয়েছে। 'কালিকামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' পুরোপুরি কাল্পনিক প্রেমের কাহিনি এবং 'মানসিংহ' ঐতিহাসিক কাহিনি হলেও অনৈতিহাসিক ঘটনায় পূর্ণ।

ভারতচন্দ্র যুগসন্ধির কবি। তাই যুগ বদলের ছাপ তাঁর সাহিত্যে স্পষ্ট। তিনি পুরাতন মঙ্গলকাব্য ধারাকে নতুন রূপ ও রস সহকারে পরিবেশন করেছেন। তাই তাঁর কাব্যটিকে 'নূতন মঙ্গল' বলা হয়। কিন্তু পুরাতনকে তিনি সম্পূর্ণ বাদ দেননি :

"অন্নদামঙ্গল সম্পূর্ণ রোমান্টিক কাব্য নয়, পুরাতন মঙ্গলকাব্যের অনেক দায় কবিকে এখানে বহন করতে হয়েছে, তবু কবি পুরনো জিনিসকে মার্জনার দ্বারাই এমন রূপ-রসোজ্জ্বল করে তুলেছেন যে, নবপুরাণপাঠের আনন্দময় উত্তেজনা আমরা লাভ করি"[৩]।

বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণে পণ্ডিত ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে লৌকিক ধারার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনির মিলন ঘটিয়েছেন। 'অন্নদামঙ্গল'-এর বন্দনা খণ্ডে তিনি বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা করেছেন _____ গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কৌষিকী, অন্নপূর্ণা। এই সব দেব-দেবীরা পৌরাণিক। 'গণেশবন্দনা' অংশে কবি ব্রহ্মাকে সকল দেবতার আদি-রূপ বলেছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল সেই ব্রহ্ম। গণেশের 'বিঘ্নরাজ' নাম পুরাণে পাওয়া যায়। এই বন্দনা অংশটি গণেশ পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। 'শিব-বন্দনা' অংশে শিবের বিরাটরূপ বর্ণনাকালে কবি বলেছেন "চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন"। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়

রয়েছে "শশীসূর্য্য নেত্রাং"। এখানেও চন্দ্র ও সূর্যকে শিবের নেত্রদ্বয় বলা হয়েছে। 'সূর্য-বন্দনা' অংশে সূর্যের দ্বাদশমূর্তি বর্ণনায় বহ্নিপুরাণের 'সর্বলোক প্রসবনাৎ' স্তোত্রের মিল পাওয়া যায়। 'লক্ষ্মী-বন্দনা'য় বিষ্ণুপুরাণের প্রভাব পড়েছে। 'সরস্বতী-বন্দনা'য় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের 'রাগাধিষ্ঠাতৃদেবী' বন্দনার সাদৃশ্য রয়েছে। 'কৌষিকী-বন্দনা'য় কৌষিকী দেবী দুর্গার আরেক রূপ। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুর ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করার জন্য এই দেবী আবির্ভূতা হন। এই কাহিনিটি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্যম' ধর্মগ্রন্থের থেকে নেওয়া। অন্নপূর্ণার রূপ ও মহিমা বর্ণনায় কবি উপনিষদ, তন্ত্র পুরাণ এবং নানা শাস্ত্রের উক্তি ব্যবহার করেছেন।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিব-কাহিনিরই প্রাধান্য। সর্বত্র পৌরাণিক শিবের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। শিবপুরাণে শিবকে বন্দনা করে বলা হয়েছে 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বরম'। ভারতচন্দ্র এর অনুকরণে লিখলেন 'মায়ামুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব, কে বুঝিতে পারে তব মায়া'।

মধ্যযুগের সাহিত্যে শিব ক্রমশ লৌকিক আদর্শ পরিত্যাগ করে পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে ছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে শিবের লৌকিক ও পৌরাণিক দুই চিত্রের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। এই কাব্যটিতে, বস্তুত, কয়েকটি শৈব ও বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক পুরাণের আখ্যান অনুসৃত হয়েছে। অন্নদামঙ্গলের কাহিনি-ভাগের জন্য ভারতচন্দ্র যে পুরাণকেই আশ্রয় করেছিলেন তা আদর্শ সংস্কৃত পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর একটি উক্তিতে সুস্পষ্ট :

"একমত না হয় পুরাণ মত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিমন্ত্র মত"।।

(প্রসূতিস্তবে দক্ষের জীবন, অন্নদামঙ্গল)

ব্যাসের শিবনিন্দার কাহিনি রচনায় তিনি কাশীর মাহাত্ম্যসূচক পুরাণ 'কাশীখণ্ড'-এর সাহায্য নিয়েছেন:

"শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ।।"

(ব্যাসের শিবনিন্দা, অন্নদামঙ্গল)

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণের ওপর ভারতচন্দ্রের শিবকাহিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

মুকুন্দরামের প্রায় সমসাময়িক কাল থেকেই মঙ্গল কাব্যগুলির ওপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। ভারতচন্দ্রও এর ব্যতিক্রম নয়। পণ্ডিত, সুরসিক ও কবি ভারতচন্দ্র রাজপ্রীত্যর্থে অন্নপূর্ণার পূজা প্রচারের জন্য মূলত পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বন করেছিলেন। গ্রাম্যকাহিনি পরিত্যাগ

করে অর্বাচীন পুরাণ থেকে কাব্য-কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন। ফলে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী ক্রমশ অন্নদায় পরিণত হয়। একটি বিশেষ পুরাণের প্রভাব এই সময় অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করা যায়। তা হলো মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই পুরাণেই চণ্ডীকে আমরা দুর্গারূপে পাই। পরবর্তীকালে এই দুই দেবী অভিন্ন হয়ে সমাজে লৌকিক চণ্ডীর অস্তিত্ব মুছে ফেলে এবং পুরাণোক্ত চণ্ডীই লোকসমাজে স্থান অধিকার করে।

মহাভাগবত পুরাণ অনুসরণে লেখা 'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ' অংশটি। শিব সতীকে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি না দিলে সতী তাঁর দশমহাবিদ্যারূপ দর্শন করায়। জগতের সর্বত্র সেই রূপের প্রতিফলন দেখতে পান শিব। তখন বিস্মিত শিবের উক্তি :

"এ কি মায়া এ কি মায়া কর মহামায়া।
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া"।।

(সতীর দক্ষালয়গমন, অন্নদামঙ্গল)

তাছাড়া দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ এবং দক্ষযজ্ঞপণ্ড প্রভৃতি কাহিনি ভাগবত পুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে রচিত। পুনর্জন্ম প্রাপ্তির পর দক্ষ যে শিবের স্তব বর্ণনা করেছেন তাতে বিষ্ণুপুরাণের প্রভাব পড়েছে। 'তুমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মা, তুমি হরিহর', 'তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও', 'পঞ্চভূতয়, পঞ্চভূতময় নও', 'নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম' প্রভৃতি পংক্তিতে এই প্রভাব সুস্পষ্ট।

'পীঠমালা' অংশে যে একান্ন মহাপীঠের বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে দিয়েও পৌরাণিক ভাব পরিমণ্ডল ফুটে উঠেছে। শিব কর্তৃক মদনভস্ম, রতির বিলাপ এবং পুনরায় কৃষ্ণের পুত্ররূপে মদনের জন্ম প্রভৃতি অংশ মহাভাগবত পুরাণ থেকে গৃহীত। হরগৌরীর রূপ এবং হরগৌরীর কথোপকথন অংশটির সঙ্গে শিবপুরাণের সাদৃশ্য রয়েছে। শিব ও ব্যাসের কলহ বর্ণনায় ভারতচন্দ্র স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে উপাদান গ্রহণ করেছেন। স্কন্দপুরাণে ব্যাস বলেছিলেন 'সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিসত্যং ন মৃষা পুনঃ। ন বেদাদপরং ন দেবোহচ্যুততঃ পরঃ'। অন্নদামঙ্গলেও অনুরূপ উক্তি পাই ব্যাসের :

"সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্বশাস্ত্রে বেদমুখ্য সর্ব দেহে হরি"।।

(ব্যাসের শিবনিন্দা, অন্নদামঙ্গল)

হরি ও হর একাত্মা, দুয়ের মধ্যে যে কোনো প্রভেদ নেই _____ এই তত্ত্ব কথার বর্ণনা রয়েছে কাশীখণ্ডে "যথাশিব স্তথাবিষ্ণু যথাবিষ্ণু স্তথাশিবঃ"। অন্নদামঙ্গলে বিষ্ণু ব্যাসকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন 'যেই শিব সেই আমি, যে আমি সেই শিব।' 'ব্যাসের কাশী নির্মাণোদ্যোগ' অংশে যে গঙ্গাস্তব

আছে তাতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া কাশীর মাহাত্ম্যগান স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়।

এইভাবে ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলের কাহিনি নির্মাণ এবং চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এক পৌরাণিক ভাবমণ্ডল তৈরি করেছেন। সর্বত্র কবি পৌরাণিক মহিমাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং তা করতে গিয়ে তিনি পুরাণ কথাকে স্বকীয় ভাবনায় রূপান্তরিত করে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে কাব্য হয়ে উঠেছে রসময় ও উপাদেয়।

পাদটীকা:

১. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'কবি ভারতচন্দ্র', মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬০, পৃ: ১১।
২. ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা), 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭৩, ২০১৩ পৃ: ৫৫।
৩. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'কবি ভারতচন্দ্র', মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬০, পৃ: ২৮৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'কবি ভারতচন্দ্র', মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬০।
২. ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা), 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৭৩, ২০১৩।
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', কলিকাতা বুক হাউস, ১৯৩৯।

সুধন্বা দেববর্মার 'এগিয়ে চলো' নাটক : একটি পাঠ

বিপ্লব দেববর্মা

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম রাজ্য ত্রিপুরা। রাজ্যটিতে দীর্ঘ কয়েকশ বছর রাজন্য শাসন কায়েম ছিল। সেই সময়ে ত্রিপুরার জনজাতিরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়নি। স্বাভাবিকভাবে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। রাজন্য শাসনে পাহাড়ি জনপদে শিক্ষা প্রসারের কোন উদ্যোগই ছিল না। শিক্ষার যাবতীয় পরিকাঠামো ছিল আগরতলায়। সেখানে খুব সযত্নে রাজকর্মচারী আর ঠাকুরকর্তার সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হত। জনজাতিদের সহজ সরল স্বভাব, নিত্য দারিদ্র এবং অন্ধ রাজানুগত্যই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। এছাড়া তৎকালীন জনজাতিদের জীবিকা ও অর্থনীতির মূল উৎস ছিল জুমচাষ। অনেকে আবার সমতলে বাস করতো। বছরের একটা সময় জুমচাষের জন্য জুমের টংঘরে থাকতো। ফসল তোলা শেষ হলে সমতলে নেমে আসত। পাহাড় জঙ্গল ঘেরা গ্রামগুলির দূরত্ব ছিল অনেক বেশি।

রাজন্য শাসনকালে রাজাদের মনে আশঙ্কা ছিল জনজাতিরা শিক্ষিত হলে বিদ্রোহ করবে, রাজাদেশ অমান্য করবে, অধিকার আদায়ে সোচ্চার হবে। তাই কোনভাবেই তাদের শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া যাবে না। বরঞ্চ জনজাতিদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মহারাজার নিজস্ব সংগঠন তৈরি করা হয়। নাম বিনন্দিয়া সংগঠন। এই সংগঠন নিষ্ঠুরভাবে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো। সেরকমই একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান বিনন্দিয়া ছিলেন রামকুমার ঠাকুর। নিজের বুদ্ধিমত্তায় অতি সহজেই রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কথায় কথায় একদিন তিনি রাজাকে বলেছিলেন যে রাজা হয়তো জনজাতিই নন। কারণ রাজকার্য পরিচালনার কাজে কোন তিপ্রা রাজকর্মচারী নেই, শিক্ষক নেই, মন্ত্রী নেই। এতে মহারাজা বীরবিক্রম রাগান্বিত হয়ে বাস্তব সত্যটি বলে ফেলেন "তিপরাকে যদি লেখাপড়া শেখাই, তা হলে একদিন আমার ঘাড়ে এসে ধরবে।"[১] জনজাতিদের শিক্ষা দান না করার মূল কারণ ছিল মহারাজার এই স্বীকারোক্তি।

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার জনজাতি অঞ্চলে বাসকারী মানুষদের যাপিত জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিল দারিদ্র, অশিক্ষা এবং সামাজিক বৈষম্য। এসব থেকে মুক্তিলাভের জন্য ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সদরের দুর্গাচৌধুরী

বিপ্লব দেববর্মা,
গবেষক, ককবরক বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

পাড়াতে গড়ে উঠে 'জনশিক্ষা' সমিতি'। সুধন্বা দেববর্মাকে সভাপতি, দশরথ দেববর্মাকে সহ-সভাপতি, হেমন্ত দেববর্মাকে সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করে 'জনশিক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। 'জনশিক্ষা সমিতি' গঠিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয় জনজাতি সমাজের শিক্ষার আন্দোলন, স্বপ্ন পূরণের লড়াই। দীর্ঘ রাজন্য শাসনে এই রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। ১৯৪৭ সালে রাজ্যের সর্বমোট হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল নয়টি। এম. ই. স্কুলের সংখ্যা ছিল পঁচিশটি। এসব স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা যায়। তখনকার সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৫০টি। (তথ্যসূত্র : ত্রিপুরা গেজেট সংকলন, পৃ : ৩১৫-৩১৬)

জনশিক্ষা আন্দোলনের ফলে গ্রামে গঞ্জে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজের অন্ধ কুসংস্কার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা থেকে জনজাতিরা বেরিয়ে আসতে শুরু করে। 'জনশিক্ষা' সমিতি'র উদ্যোগে তখন প্রায় ৩০০/৪০০টি স্কুল সরকারী মঞ্জুরিভুক্ত করা হয়। রাজন্য শাসনকালে জনজাতিরা শিক্ষা লাভ করতে পারেনি। একদিকে দারিদ্র, অশিক্ষা আর অন্যদিকে রাজা, মহাজনের শোষণ, অত্যাচার তাদের নাজেহাল করে তুলেছিল। শেষে ধীরে ধীরে জনজাতি যুবসমাজ এই সঙ্গিন অবস্থার অনুধাবন করতে পারে এবং উত্তরণের পথ খোঁজা শুরু করে।

নাট্যকার সুধন্বা দেববর্মা নিজেও জনশিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক ছিলেন। সাহিত্য-সমাজে ও শিক্ষা প্রসারে এই জনশিক্ষা আন্দোলনের সুফল সুদূরপ্রসারী। নিঃসন্দেহে সুধন্বা দেববর্মার 'এগিয়ে চলো' নাটকটি জনশিক্ষা আন্দোলনেরই ফসল। এই আন্দোলনের পরই সুধন্বা দেববর্মা ককবরক ভাষায় নাটক লেখায় হাত দেন। যদিও 'এগিয়ে চলো' নাটকটি দ্বি-ভাষিক। নাটকটি বাংলা এবং ককবরক দুই ভাষার সংমিশ্রণে লেখা। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০-৫৫ সালে।

সুধন্বা দেববর্মার 'এগিয়ে চলো' নাটকে গ্রামের সহজ, সরল মানুষদের মহাজনী শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা, লাঞ্ছনার পাশাপাশি এর থেকে উত্তরণের প্রয়াস রয়েছে। এসব অত্যাচার, শোষণ থেকে রক্ষা পেতে গেলে প্রথমে দরকার সচেতনতা। শিক্ষা সেই সচেতনতা আনে। নাটকে গরীব সহজ, সরল মানুষেরা সংসার চালাতে না পেরে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয়। পড়াশোনা না জানার দরুণ তাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ সুদে টাকা আদায় করে। ঋণের জালে জড়িয়ে তাদের জীবনকে তছনছ করে দেয়। জনশিক্ষা আন্দোলনের ঢেউ গ্রামাঞ্চলে আছড়ে পড়ে। ফলত মানুষ সচেতন হতে থাকে এবং অন্যায়, অবিচারের প্রতিবাদে সামিল হয়। নিজের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়। এই সব বিষয় নাটকে উঠে এসেছে। নাটকে কৃষক সমিতির কথা রয়েছে। সমিতির সাংগঠনিক কর্মকর্তারা রাজেন, ব্রজেন ও অমর। সংগঠনকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় সে চিন্তাতে সবসময় ব্যস্ত

থাকে। অফিস ঘরে যখন তারা সাংগঠনিক আলোচনায় ব্যস্ত তখন এক সাধারণ কৃষক রহমান তার সমস্যা নিয়ে হাজির। ব্রজেনের কাছে তার সমস্যাটা তুলে ধরে "বাবু, আমার বলদ জোড়াডা বাইন্দা লইয়া গেছে। তহশীল বাবুদের ঘুষ না দিলে গরুগুলি ছাইড়া দিত না"[২]। রহমান কৃষিকাজ করে সংসার চালায়। কৃষিকাজে দরকারি গরু দুটো মহাজন নিয়ে গেছে। কারণ রহমান মহাজনকে টাকা দিতে পারেনি। গরু দুটো ফেরত পেতে গেলে টাকার দরকার। তাই সে সুবিচার পেতে কৃষক সমিতির সদস্যদের কাছে এসেছে। রাজেন দেশভক্ত, সমাজ কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। ভালো কাজেই উৎসাহ। মন্দ এবং অন্যায় কাজ থেকে শতযোজন দূরে থাকে। তাই সে বলে "ঘুষ দিয়া আপনার বলদ জোড়াটা আনলে চলবে না। অমর তুমি যাও, রহমান কাকার সাথে"[৩]। গ্রামাঞ্চলেও জনশিক্ষা সমিতির শিক্ষা আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। ফলস্বরূপ রাজেন, ব্রজেনের মত মানুষেরা সচেতন হয়ে সমাজের অন্যায়, অবিচার ও মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস অর্জন করে। ঘুষ তো আর সারাজীবন দেওয়া যাবে না। এমনিতেই তারা গরীব। তাছাড়া ঘুষ নেওয়া যেমন অপরাধ তেমনি ঘুষ দেওয়াও সমান অপরাধ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে পরবর্তীসময়ে তা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। একবার টাকার বিনিময়ে গরুগুলি ছাড়িয়ে আনলে তো হবে না বা মহাজনকে বেশি সুদ দিয়ে রেহাই পেলেও হবে না। এভাবে বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এরজন্য সত্য এবং ন্যায়ের পথ অনুসন্ধান করে অনুসরণ করতে হবে।

রহমানের মত গ্রামের অনেক লোকেই মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয়। সময় মত পরিশোধ করতে না পারলে দ্বিগুণ সুদের অঙ্ক লিখে রাখে। এভাবে গ্রামের উন্নতি হয় না। সহজ সরল গ্রামবাসীর বেদনাকে অনুভব করেছিল রাজেনরা। তাই রাজেনের কণ্ঠে "এমনি করে কত রহমান, কত তখিরায়, পুনখিরায় পথে বসেছে। এরা পথ পায় না। নিজের দুরবস্থাকে কপালের দোষ দিয়ে সান্ত্বনা লাভ করে। দারিদ্রকে ভগবানের বিধান বলেই মেনে নেয়। এ শোষণের প্রতিকারের কথা চিন্তাও করতে পারে না এরা"[৪]। গ্রামের সহজ সরল মানুষদের সংগঠিত করে তুলতে হবে। নিজেদের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে চলার রাস্তা দেখিয়ে দিতে হবে। স্বাবলম্বী হওয়ার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এসবের জন্য দরকার শিক্ষার। তাই গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। দারিদ্রকে কপালের দোষ না দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথ তৈরি করে দিতে হবে। এসব করে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিশায় নিয়ে আসা যাবে। তাই ব্রজেন বলেছিল "এদের সংগঠিত করে তুলতে হবে রাজেন দা"[৫]।

'এগিয়ে চলো' নাটকটি যখন রচিত হয়েছিল সেসময় একদিকে যেমন

রাজতন্ত্রের অবসান তেমনি অন্যদিকে দারিদ্র, অশিক্ষা ও মহাজনী শোষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। তৎকালীন ত্রিপুরা সরকারের নানা রাজনৈতিক কৌশল জনজাতিদের জীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। রাজেন এই সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরেছিল। সে লক্ষ্য করেছে গ্রামের অনেক লোকেই মদ খেয়ে ঝগড়া করে। এই ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। গ্রামের হারি ও পুনখি দুজনই মদ খেয়ে ঝগড়া শুরু করলে রাজেন বলে "এরা মদ খায় না, মদ এদের খেয়ে ফেলেছে। নেশা মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে এদের। মাদকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে; নতুবা মুক্তি আন্দোলন কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠবে না। আমাদের প্রথম অভিশাপ হচ্ছে – অশিক্ষা, দ্বিতীয় অভিশাপ হচ্ছে দারিদ্র। এ দুটো অভিশাপ থেকেই আমাদের মুক্তি পেতে হবে। সমাজ দেহ থেকে কুসংস্কার, কু-রীতিনীতি সমস্ত ঝেড়ে ফেলতে হবে। চলো ব্রজেন, একবার ঘুরে আসা যাক"[৬]। রাজেন মনোকষ্ট নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হলে নেশামুক্ত সমাজ গড়তে হবে। নেশাসক্ত মানুষ দিয়ে কোন কাজই হবে না সেটা তারা বোঝে। তাই তাদের সংগঠনের প্রথম কাজই হচ্ছে নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। তাই রাজেন মাদকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দিয়েছে। অশিক্ষা ও দারিদ্র থেকে মানুষকে মুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যমেই উন্নত ও সুস্থ সমাজ গড়া সম্ভব। ব্যাপারটা রাজেনও বোঝে। জনজাতিরা সবদিক থেকেই পিছিয়ে। সেজন্য গ্রামেগঞ্জে দরকার লেখাপড়া জানা সচেতন লোকের। তারা সংগঠন তৈরি করবে এবং মানুষদের সচেতন করে তুলবে। সচেতনতায় নেশামুক্ত সমাজ ও মহাজনী শোষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। জনশিক্ষা সমিতির জন্ম রাজ আমলে। নাটকে মহারাজের মানসিকতার কথাও রয়েছে "প্রজা প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ, দায়িত্বশীল সরকার গঠন, এসব আওয়াজই শোনা যাচ্ছে কংগ্রেস তরফ থেকে"[৭]। কারণ জনগণ সচেতন হলে মহারাজেরই ক্ষতি। গণতন্ত্র শক্ত হলে রাজতন্ত্রের অবসান অবধারিত। এটাই মহারাজের চিন্তার কারণ। গণপতির কথায় "প্রজারা ঐক্যবদ্ধ হলে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে মহারাজ"[৮]। জনগণ সচেতন হলে মহারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। তার কিছু আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা প্রজারা আগের মত নীরবে সবকিছু মানতে নারাজ। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠাচ্ছে। মহাজনের অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে রহমানের মত সাধারণ চাষিও মুখ খুলেছে "ধান বলে হাত টেহা, চাইল হাতর টেহা, কওনের আছেনি? তারারডা কমাইয়া দেউক না, হতর টেহা কিরে দশ টেহায় আমরা চাইল বেচাম। আসল কতা এমনে আর অইত না, নেতারা যেমন কইছে চলতে অইব। রাজ্যের হক্কল পরজা মিইলা আন্দোলন না করলেনি অয়?"[৯] রাজেনের পরামর্শে গ্রামাঞ্চলের কিছু লোক মেট্রিক, আই. এ., বি. এ. পাশ করেছে। প্রফুল্লও বই পড়তে আগ্রহী

হয়েছে। সে পড়ছে "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' এঁ এঁ এঁ, ল – একার লে, খ – আকার খা – লেখা"[১০]। অন্যকে শেখানোর জন্য বাল্যশিক্ষা পড়া শুরু করেছে। শুধু নিজে পড়তে পারলে হবে না সবাইকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সমাজের উন্নতির কথা সে ভাবে। সাংগঠনিক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছে। তাই সে বলে "আমাকে বিয়ে করার কথা ছেড়ে দাও। আমি বিয়ে করব না। আমাকে আগে পড়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, মূর্খ বানিয়ে রেখেছে। রাজেনদা আর ব্রজেনদাদার সঙ্গে থেকে থেকে লেখাপড়া শিখে নিব। কাজ নেই এখন বিয়ে করব। ওদের মত করে আমিও দেশের কাজ কর্‌তে চায়"[১১] ব্রজেনও চায় না এত কম বয়সে প্রফুল্লের বিয়ে হোক। তাই সে প্রফুল্লের মা গয়ালক্ষীকে বলে "এত কম বয়সে বিয়ে করে নিজের সন্তানদের সর্বনাশ করবে না, সমাজেরও ক্ষতি হয়। সময় আসলে সে নিজেই বিয়ে করার কথা চিন্তা করবে"[১২]।

'এগিয়ে চলো' নাটকের মধ্যে দেখা যায় গ্রামের অধিকাংশ মানুষেরাই সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকেই কিছুই পায় না। সে ব্যাপারে রামমানিক মহানন্দকে বলে "মহাজন, আমরা দেখি কাপড়ও পায় না, কেরোসিন তেলও পায় না। কেবল কন্টল কন্টল নামই হুনে, কন্টলের কোন জিনিষই পায় না"[১৩]। সাধারণ মানুষ

ন্যায্যমূল্যের দোকানের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। রামমানিকের কথার প্রেক্ষিতে প্রফুল্ল বলে "গরীবের দল না জাগলে কিছুতেই এ শোষণ বন্ধ হইত না"[১৪]। কেননা এক শ্রেণির লোক ন্যায্যমূল্যের দোকানের জিনিষ চড়া দামে খোলা বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। এসব প্রফুল্লের জানা। তাই সে সাধারণ মানুষদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান করেছে।

নাটকে অন্যতম চরিত্র মহাজন মহানন্দ। মহানন্দ খুবই চতুর এবং ধূর্ত। সবার সঙ্গে মিষ্টি সুরে কথা বলে। প্রফুল্লের মতের সঙ্গে তার মত মেলে না। এটাই স্বাভাবিক। তাই সে বিরোধিতা করে বলে "কি অন্যায়, কিসের বিরুদ্ধে দাড়াইবা, কও দেখি? প্রফুল্ল মহানন্দকে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল – মহাজন অন্যায় কি তাও বুজাইয়া কইতে হইব? কি করছ, চিন্তা কইরা দেখলেই অয়। একদিন এ মুলুকে আইসিলা লোটা আর কম্বল লইয়া, কি ছিল তোমার? পাড়ায় পাড়ায় গাওয়াল কইরা বেড়াচ্ছ। কাকা, মামা সম্বন্ধ পাইতা ভাব জমাইছ, আর বাঁশ ভরশ। জিনিষ বাকি দিয়া খাতায় দুইগুণ তিনগুণ দাম লেইখা রাখছ, দাদন দিয়া সুদের উপর সুদ লাগাইছ, এমনি কইরা সরল প্রজাদের জমি লেইখা লইছ। অন্যায় কারে কয় হিতা বলে এখনও বুঝেনা, হুঃ"[১৫] প্রফুল্ল লেখাপড়া করে সচেতন হয়েছে এবং প্রতিবাদ করার সাহস অর্জন করেছে। পাশাপাশি অন্যায়, শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

যুবসমাজই পারে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। নাটকেও দেখি রাজেন, ব্রজেন, অমররা জাতিকে দারিদ্র, অশিক্ষা থেকে মুক্তি দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দৌলতে মহাজনরা নিজেদের স্বভাব কিছুটা হলেও পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। আগের মত আর ঠকাতে সাহস পায় না। স্কুল খোলার ব্যবস্থা করেছে। বর্দ্ধমানের কথাতেই স্পষ্ট "আন্দোলন করার পর সরকার ইস্কুল খুলে দিতে বাধ্য হল। আগে কয়টি জায়গায় বিদ্যালয় ছিল। টাউন, বাজারে কয়েকটা মাত্র। আর পাহাড়ে কয়টা আছে"[১৬]। রাজেনের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে "আমরা সমিতি গড়ে তুলেছি কেন, সেকথা অনেকবার শুনেছেন। আপনাদের উৎসাহে গ্রামে গ্রামে শত শত স্কুল গড়ে উঠেছে। মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য জনতা জেগে উঠেছে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে....."[১৭] তাদের একতা দেখে রাজাও ভয় পেয়ে গেছে। তাই তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে থামানোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রাজনের বক্তব্য "আজ আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে কে আমাদের শত্রু, কে আমাদের মিত্র। একটি জাতি বা সম্প্রদায় শত্রু নয়। প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের অধিকারী শোষকেরাই শত্রু।"[১৮] কাজেই সাবধান থাকতে হবে। তার সাহসী কার্যকলাপ এবং সুপরামর্শে জনসাধারণের বোধশক্তির উদয় হতে শুরু করে। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারলে নিজের অধিকার ও স্বাধীনতার সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। মহারাজা তাদেরকে শায়েস্তা করতে না পেরে বলে "রাজদ্রোহী। তোমরা আমার কাজে হস্তক্ষেপ করতে গিয়েছ। তোমরা কমিউনিস্ট"[১৯]। তৎক্ষণাৎ অমরের প্রত্যুত্তর "আমরা কমিউনিস্ট বুঝি না। আমরা জনশিক্ষা, জনসেবার কথাই জানি"[২০]। মহারাজার মনোভাব নাটকে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে "অনেকের ধারণা পাহাড়িয়া প্রীতি আমার একটু বেশি। মুর্খের দল, রাজনৈতিক চালও বুঝে না। নিজের আসল জিনিষ শিক্ষা, যেটা এদের দিই না। পরস্পরের মধ্যে বিভেদ লাগিয়ে রাখাই আমার উদ্দেশ্য। লেখাপড়া শিখতে এদের কিছুতেই দেব না"[২১]।

নাটকে নারী চরিত্রের মধ্যে প্রভা, সুনীতি ও রমাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রভার মতে শুধু আন্দোলন নয় সব কাজে নারীদেরও স্থান দেওয়া দরকার। এতেই সর্বজনীন বিকাশ সম্ভব। রাজেনও সমর্থন করে "মিসেস রায়, গঠনমূলক কাজ শুরু করুন, তার ভিতর দিয়ে নারী সংগঠন গড়ে তুলতে পারবেন। আজ আপনারা এগিয়ে এসেছেন। নিশ্চয়ই নারী সংগঠন গড়ে উঠবে"[২২]। রাজেনের কাজ এবং নারীদের প্রতি তার সমীহভাব সবাইকে মুগ্ধ করে। নারীরা শিক্ষিত হলে সমাজ দ্রুতগতিতে এগোবে। তখন প্রভা বলে "কিন্তু আমাদের শিক্ষিত নারী কর্মী যে খুব কম। আপনাদেরও সহায়তা করতে হবে"[২৩]। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও সমাজকে দ্রুত উন্নতির শিখরে পৌঁছানো যাবে। লক্ষ্য আর

উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করলে কাজের সফলতা আসবেই। ব্রজেন, রাজেন অমরদের সহায়তায় প্রভারা নারী সংগঠন গড়ে তোলে। ওরা কাজে নেমেছে। প্রভার কথায় "এখনো বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। গ্রামে গ্রামে মেয়েদের স্কুল গড়বার জন্য উৎসাহিত করেছি। ইতিমধ্যে কয়েকটি স্কুলও হয়েছে। আমি নিজেও একটা মেয়ে স্কুলে কাজ করি"[২৪]। এভাবে গ্রামেগঞ্জে নারীপুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে নারীদের শিক্ষা দান শুরু হয়। শুধু সরকারের উপর বসে না থেকে নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। যেসমস্ত অভিভাবকরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না তাদের বোঝাতে হবে। দরকার পড়লে আইন করে দিতে হবে। তাই সুনীতি রাজেনকে বলে "আপনারা আইন করে না দিলে হবে না"[২৫]। ছোটবেলায় পড়ার সুযোগ হয়নি সুনীতির। তাই নিজের ও অন্যকে অক্ষর চেনানোর জন্য বাল্যশিক্ষা পড়া শুরু করে দিয়েছে। তার অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়। তৎসময়ে প্রভা সুনীতির মতো অনেক মেয়েরা শিক্ষা প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। পণবিরোধী অভিযানে নেমেছে। মেয়েদের স্বাধিকারবোধ সম্পর্কে অবগত করেছে। তাই রমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে "মেয়েরা বিয়ে করার সময় বরকে (পাত্রকে) পণ দিয়ে বিয়ে করতে হয়, মেয়েরা বিক্রি হবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে না"[২৬]। সুনীতির মতে মেয়েরাও ছেলেদের মত সম্পত্তির অধিকারী হওয়া উচিত। তাই তার কণ্ঠে প্রতিবাদ "আমরা বিক্রি হওয়ার জন্য জন্মায় না। আমাদের অধিকারকে আমরা যে কোনভাবেই হোক আদায় করে নেব"[২৭]। তারাও সমাজের কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অত্যাচার, অশিক্ষা, শোষণ ও দারিদ্র দূরীকরণই তাদের জীবনের মূলমন্ত্র।

জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনজাতি সমাজে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে জনজাতিদের মধ্যে রেনেসাঁসের সৃষ্টি হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। একদিকে রাজতন্ত্রের অবসান অন্যদিকে মহাজনী শোষণ, সরকারের অত্যাচার সব মিলিয়ে সেসময় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু রাজেন, ব্রজেন, প্রভা, রমাদের মত সচেতন ও চিন্তাশীল মানুষের গঠনমূলক কাজই সমাজকে দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কার, শোষণ, অত্যাচার থেকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সব মিলিয়ে সুধন্বা দেববর্মার 'এগিয়ে চলো' নাটকটি তৎসময়ের জনজাতিদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১) কুমুদকুন্ডু চৌধুরী, শুভব্রত দেব, সুধন্বা দেববর্মা (সম্পা) : ১৯৯৬ : ১৮
২) সুধন্বা দেববর্মা : ১৯৫০-৫৫ : ১০

৩) তদেব : ১০
৪) তদেব : ১১
৫) তদেব : ১১
৬) তদেব : ১২
৭) তদেব : ১২
৮) তদেব : ১২
৯) তদেব : ১৭
১০) তদেব : ১৮
১১) তদেব : ১৮
১২) তদেব : ১৮
১৩) তদেব : ২০
১৪) তদেব : ২০
১৫) তদেব : ২১
১৬) তদেব : ৩৪
১৭) তদেব : ৫০
১৮) তদেব : ৫০
১৯) তদেব : ৫৩
২০) তদেব : ৫৩
২১) তদেব : ৪১
২২) তদেব : ৩৭
২৩) তদেব : ৩৭
২৪) তদেব : ৩৭
২৫) তদেব : ৩৮
২৬) তদেব : ৪৪
২৭) তদেব : ৪৪

সহায়ক গ্রন্থ

১) কুমুদকুন্ডু চৌধুরী, ১৯৯৯, ককবরক ভাষা ও সাহিত্য, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা

২) কুমুদকুন্ডু চৌধুরী, শুভব্রত দেব, সুধন্বা দেববর্মা (সম্পা), ১৯৯৬, পটভূমি আন্দোলন এবং জনশিক্ষা সমিতি, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা

৩) নিরঞ্জন দেব্বর্মা, ২০১৩, জনশিক্ষা আন্দোলন : ইতিহাস ও মূল্যায়ন, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা

৪) রবীন্দ্রকিশোর দেববর্মা, ২০১৩, ককবরক ককরৌবায়নি রুকুঙগ, জরা পাবলিকেশন, আগরতলা

৫) রমা দাস, ২০১৯, দশরথ দেব এক অবিসংবাদিত আপসহীন যোদ্ধা, জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা

সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ : মালো জীবনের আখ্যান

সৌম্যদীপ দেব

বাংলা সাহিত্যের এক প্রতিভাবান লেখক হলেন সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)। যিনি কালকূট ছদ্মনামেও সমানভাবে পরিচিত ছিলেন। জীবনভর লিখেছেন একের পর এক আখ্যান। তুলে একদিকে তুলে এনেছেন আঞ্চলিক জীবন, নগর জীবনের সমস্যা দীর্ণ বাস্তব প্রেক্ষাপট, তেমনি অন্যদিকে ভ্রমণ মূলক ও রাজনৈতিক উপন্যাসে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রকৃতি আর রাজনীতির প্রভাবকে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। ' উওরণ ' বা ' জগদ্দল' এর মতো এপিক ধর্মী উপন্যাস যেমন তাঁর কাছে থেকে আমরা পেয়েছি ; তেমনি 'বিবর', 'প্রজাপতি' বা 'পাতক' এর মতো কিছু বিতর্কিত উপন্যাসও আমরা পেয়েছি। আবার ' খন্ডিতা ' বা ' শেকল ছেড়া হাতের খোঁজে ' র মতো রাজনৈতিক উপন্যাস লিখে তিনি রাজনৈতিক উপন্যাসে নবনির্মাণের চেষ্টা করেছেন। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে এমন উচ্চ প্রতিষ্ঠিত লেখক হয়েও বাংলা সাহিত্যে আজও তিনি খুব যে আলোচিত তা নয়। তবে তাঁর যে সমস্ত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে তাঁকে পরিচিত করে তুলেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসের হল - 'নয়ন পুরের মাটি', 'উত্তরবঙ্গ', 'গর্ভধারিণী', 'প্রজাপতি', 'বিবর', 'শ্রী চৈতন্য', 'কোথায় পাব তারে', 'বিটি রোডের ধারে', 'গঙ্গা', 'শাম্ব' ইত্যাদি।

নদী পিলসুজ হিসাবে কাজ করে। নদীকে কেন্দ্র করেই সমাজ গড়ে উঠে। মানব জীবনে নদীর গুরুত্ব কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক যখন কোনো ঘটনা বা বিশেষ কোনো কাহিনির পরিবর্তে কোনো স্থান-কাল-পাত্রকে মুখ্য করে তোলেন তখন সেই অঞ্চল বা স্থানের ওপর ঔপন্যাসিক স্বাভাবিকভাবেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আর এর ফলে সেই স্থানের নিগুঢ় নির্যাস হয়ে ওঠে সেই উপন্যাস। বাংলা সাহিত্য এবং বিশ্ব সাহিত্যে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা একেবারে কম নয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের নাম তুলে ধরলেই তা স্পষ্ট হবে -জর্জ এলিয়ট-এর 'দি মিল অন দি ফ্লস', আর্নেস্ট হেমিংওয়ে-এর 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দা সী', অদ্বৈত মল্লবর্মণ-এর 'তিতাস একটি নদীর নাম', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'ইছামতী', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'কাঁদো নদী কাঁদো', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', সমরেশ

সৌম্যদীপ দেব
স্বাধীন গবেষক, আগরতলা

বসু-এর 'গঙ্গা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পদ্মানদীর মাঝি', দেবেশ রায়-এর 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ', আবু ইসহাক - 'পদ্মার পলিদ্বীপ' ইত্যাদি।

উপন্যাস জীবনের কথা বলে। সমাজ - সংস্কৃতি, অভাব - অভিযোগ, সামাজিক অর্থনীতি, সুখ- দুঃখ, প্রেম- বিষাদ, জন্ম- মৃত্যু সব মিলেই গড়ে উঠেছে সমরেশ বসুর হাতে কালজয়ী উপন্যাস 'গঙ্গা'(১৯৫৭)। একটি সফল ও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। কেনো আমি ' গঙ্গা 'কে আঞ্চলিক উপন্যাস বলেছি - এর স্বপক্ষে আলোচনা ক্রমশ প্রসারিত করে আঞ্চলিক দিকটিকেই উদ্ভাসিত করেছি।

'গঙ্গা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই এর একটি সত্যনিষ্ঠ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। হিন্দুদের কাছে গঙ্গা যেমন একটি পবিত্র নদী, তেমনি ভারতবর্ষের একটি অন্যতম নদী। সমরেশ বসু 'গঙ্গা' রচনার পূর্বে বেশ কয়েকবছর অধুনা উওর চব্বিশ পরগণার হালি শহরে যাতায়াত করে ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। কারণ সমরেশ বসুর মতো বৌদ্ধা ও জিজ্ঞাসু ঔপন্যাসিক কাল্পনিকতার চেয়ে বাস্তবের মাটি আখড়ে, বিষয়ের ঘ্রাণ নিয়েই তার বাস্তব রূপকে ফুটিয়ে তুলতে অনেক বেশি পছন্দ করবেন - এটাই স্বাভাবিক। আর কল্পনার কল্পলোকের চেয়ে বাস্তবের জল-হাওয়া - মাটির মূল্য পাঠকের কাছেও নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। এই তত্ত্ব সমরেশ বসুর কাছেও অজানা নয়।

হালি শহরের রামপ্রসাদ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিমাই চাঁদ অধিকারী। নিমাইবাবুর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, তখন প্রায় তিন- চার বছর ধরে গঙ্গার তীরের মাছমারাদের সঙ্গে মেলামেশা করে জীবিকা, জীবন, সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থা সবকিছু আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন সমরেশ বসু। নিমাইবাবু তাঁর 'সমরেশদার গঙ্গা ও আমরা' প্রবন্ধে 'গঙ্গা' উপন্যাস হয়ে ওঠার ইতিহাস অসাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন। যেখানে আমরা দেখি 'গঙ্গা'র বাস্তবতা রক্ষার জন্য সমরেশ বসু নিজ দৃষ্টিকেই শুধু কাজে লাগিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা নয়, সমানে এক একটা বিষয়কে নোট নিয়ে নিয়ে লিখে রেখেছেন। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় সমরেশ বসু চেয়েছিলেন ভারত বিখ্যাত নদী গঙ্গা, এই গঙ্গা শুধু বয়ে চলেছে বছরের পর বছর তাই নয়। এর সাথে বয়ে চলেছে কিছু জীবন। বেড়ে উঠছে কিছু জীবন। তাদের কাছে গঙ্গা। তাদের চোখে গঙ্গা। যে গঙ্গা দেখেছে এই মালো সম্প্রদায়, তা আর কেউ দেখেনি। কেউ জানে না। সেই গঙ্গাকেই অত্যন্ত প্রাঞ্জল করে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু।

১৯৫৭ সালে 'গঙ্গা' উপন্যাসটি প্রথম 'জন্মভূমি' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 'গঙ্গা' উপন্যাসের দুটি দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক, নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস

হিসাবে এর বিস্তৃত আলোচনার পরিসর রয়েছে। দুই, আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে 'গঙ্গা' সব বৈশিষ্ট্যকে মান্যতা দিয়েছে। কিন্তু আলোচনার দিক নির্ধারণ করতে গিয়ে আমি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে 'গঙ্গা'র প্রসঙ্গই নির্বাচন করেছি। তা সত্ত্বেও আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে নদীকেন্দ্রিকতাও স্থান পেয়েছে।

"কোন ঔপন্যাসিক যখন কোন বিশেষ দেশাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সমাজ প্রেক্ষিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে তাঁর রচনায় রূপ দেন যাতে ঐ অঞ্চল যেন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মিক যোগে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জনজীবনে তার সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্য দিয়েও সর্বজনীন রসাবেদনে পৌঁছায় তখনই তাঁর রচনাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।"[১] বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুধাংশুশেখর মন্ডল - এর দেওয়া সঙ্গার সাথে মিলিয়ে সহজেই আমরা বুঝতে পারি 'গঙ্গা' কতটা আঞ্চলিক।

পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে 'গঙ্গা' উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের মান্যতা দানের কথা । পর পর কিছু বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে আলোচনা করলে তা সহজেই অনুমেয় হয়ে উঠবে।

আঞ্চলিক উপন্যাস গড়ে উঠে একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে। যেখানে রূপকার নির্দিষ্ট ঐ ভূভাগের কথাই তার শিল্প সংরূপে বয়ন করে থাকেন। সমরেশ বসুর এই উপন্যাসের সেই ভূখণ্ড হলো ভারত বিখ্যাত নদী পুণ্যতোয়া গঙ্গা। গঙ্গার জল ও জনজীবন। পাশ্ববর্তী সমাজ সবই সমরেশ বসুর হাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন

"একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার এরূপ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ও অন্তর্গূঢ় প্রেরণা বাংলা উপন্যাসে অন্যত্র দুর্লভ। লেখক শুধু উহাদের জীবনযাত্রার বহির্ঘটনাই বিচিত্র করেন নাই, উহাদের মুখের ভাষা, অন্তরের অর্ধস্ফুট চিন্তা ও আবেগের স্পন্দন, উহাদের জীবনবোধের সমস্ত প্রদোষান্ধকার অস্পষ্টতা ও রহস্যঘন নক্ষত্র দীপ্তি আমাদের নিকট অপূর্ব দক্ষতার সহিত উদঘাটিত করিয়াছেন। জেলেদের জীবনের সহিত তিনি এরূপ গভীরভাবে একাত্ম হইয়াছেন যে, নৌকাচালনা সংক্রান্ত সমস্ত পরিভাষা, নানারকমের ঢেউ- এর স্বরূপ ও সঙ্গা, - যাহার উল্লেখ ভদ্র সাহিত্যে পাওয়া যায় না, - তাহাও তিনি অবলীলাক্রমে আয়ত্ত ও যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। নদীর বুকের ন্যায় জেলের মনেও নানা গভীর স্তরের ছলকানি,নানা অস্ফুট রহস্যের ঝিকিমিকি, নানা তলশায়ী ছায়া - প্রতিচ্ছায়ার জড়াজড়ি, নানা আবর্তের হেঁচকা টান। আবার নদী প্রবাহের মতো জেলের চরিত্রও একটি সরল, একটানা গতি, একটি মৌলিক নীতি নির্ভরতা, একটি বলিষ্ঠ, উদার জীবনবোধও বর্তমান। তাহাদের তীরের

জীবন, তাহাদের ফেলিয়া- আসা পুত্র- পরিবার, তাহাদের গৃহের মমতা বন্ধন আকাশের এককোণে একটা ধোঁয়াটে মেঘের মতো, তাহাদের মানস- দিগন্তে একটুকরা করুণ স্মৃতির ন্যায় সংলগ্ন। তাহাদের নদীবক্ষে অতিবাহিত আসল জীবনের সঙ্গে উহার সংযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ, আকাশের সুদূর নীলিমায় উড়ন্ত ঘুড়ির সঙ্গে বালককরধৃত লাটাই-এর মতো এই বিশেষ- দর্শন- প্রভাবিত জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির পূর্বে ঔপন্যাসিক ইহার একটি প্রতিচ্ছবি সাহিত্য- চিত্রশালায় অক্ষয় করিয়া রাখিলেন।"[২]

গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের জনবসতির কাছে অর্থাৎ জেলে সম্প্রদায়ের কাছে এই গঙ্গা-ই তাদের জীবনের ধারক ও বাহক। গঙ্গার স্রোত আর জীবনের স্রোত মিলেমিশে গেছে তাদের অজান্তেই। এই তাদের নিয়তি নির্ধারিত ভবিতব্য। যাকে তারা আশৈশব থেকেই মনের মধ্যে লালন করে চলে। গঙ্গাকে নিয়েই বাঁচার সংগ্রাম, গঙ্গার বহমানতার সাথেই জীবনও বহমান। এক কথায় বলতে গেলে অভিন্ন আত্মার যোগ। জল ও জীবন একাকার। বিনিময় যা - সব তো ঐ গঙ্গার-ই সাথে। জীবন আর জীবিকা সব ঐ একেতেই সমর্পিত। গঙ্গা ছাড়া উপন্যাসে বর্ণিত মালো সম্প্রদায়ের আর কেইবা আছে। গঙ্গার জোয়ারে তারা যেমন ভাসে তেমনি ভাটায় জেলেদের মুখ শুঁকিয়ে যায়। তাই ঔপন্যাসিক লিখেছেন

"তুমি মারো মাছ, তোমাকে মারেন আর একজন। সংসারের নিয়ম। কুড়ি গন্ডাটা ব্যতিক্রম, তবে মাছমারাদের কাছে ব্যতিক্রম নয়। তার মরণের লিখন একটু অন্যরকম হয়। যার সঙ্গে তোমার বাস, যে তোমার শ্বাস, সেই মাছের সঙ্গে তোমার মরণের সুতো গাঁথা হয়। বাইরে মর আর ঘরেই মর। নিদানকালে একবার রক্তমাখা মীনচক্ষুর সঙ্গে চোখাচোখি হবে তোমার।"[৩]

আঞ্চলিক উপন্যাসে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংস্কার একটি বিশেষ রূপ লাভ করে। কেননা বর্ণিত আখ্যানের সামাজিক প্লট বিভাজন ও কেন্দ্রিকরণে আদ্যোপান্ত বাস্তবতা ধরে রাখতে ঔপন্যাসিককে নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংস্কার ও রীতিনীতির প্রসঙ্গ আনতে হয়। সামাজিক সংস্কারের চিত্রে ঔপন্যাসিক ঐ অঞ্চলের নির্যাসকে যেভাবে তুলে ধরতে পারেন, ফলত তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' তার ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে বহু জায়গায় মালো জীবনের নানা সংস্কার ধরা দিয়েছে। যেখানে কখনো সংস্কার যেমন বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আবার কখনো সংস্কার উপেক্ষিতও হয়েছে । এমনই এক- দুটো দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি -

"সাইদার কিনা! সমুদ্রের নিয়ম, যারা আসবে, সেই মাছমারারা চুল দাড়ি কাটবে না, কাপড় ছাড়বে না। করলেই অনাচার। যখন যেমন, তখন তেমন। জলের আচার- বিচার ডাঙায় চলে না। সমুদ্রে এলে, সমুদ্রের মতো। অনাচার করলে মরণ। এই একটি জিনিস, মরণ। জীবনের শেষ আর প্রথম, এইখানে পদে পদে ফেরে। জীবন মরণের পাশাপাশি বাস যে!"[৪]

কোটালের সাথে জোয়ারের সম্পর্ক আর জোয়ারের সাথে জেলেদের। তাই এখানেও রীতির বালাই, যেমন -

"আজ অষ্টমী। কিন্তু আষাঢ়ের পূর্ণিমা কোটালের কাল কেটে গেছে আগেই। এখন মরাকোটাল যাচ্ছে বলা যায়। অমাবস্যাতে আবার ভারী কোটাল আসছে। তবে সে পূর্ণিমার কোটালের মতো তেজী নয়। অমাবস্যা তার তেজ দেখাবে টানের দিনে। এখন চাঁদের কাল। দিনে দিনে সে বাড়বে, উচাটন হবে। ষোলকলা পূর্ণ হয়ে, চাঁদ হেসে হেসে সারা সংসারের চোখে নেশা ধরাবে। রসবতী গঙ্গা হারাবে কূল। মানুষ তার নিজের দিকে চেয়ে দেখুক, পূর্ণিমার কোটালে তার প্রাণও আকুল। তবে যে কোটালই আসুক, এখনো আসল জল বাকি।"[৫]

নামকরণের ক্ষেত্রেও সমরেশ বসু আঞ্চলিকতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। উপন্যাসের নামকরণ ও চরিত্রের নামকরণে তিনি পাণ্ডিত্যের নজির সৃষ্টি করেছেন। আমরা চরিত্রের নাম গুলো লক্ষ করলেই তা বুঝতে পারবো।

বিলাস - উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। নিবারণ ও পাঁচুর পরবর্তী প্রজন্ম। উপন্যাসের শেষ দিকে এই বিলাসকেই ঔপন্যাসিক বলছেন তেঁতলে বিলেস।

নিবারণ - সাইদার। সমুদ্রগামী নৌদলের সর্দার।

দামিনী- মাছ ব্যবসায়ী।

পাঁচু - নিবারণের ভাই। প্রায় সমগ্র উপন্যাসের কথক এই পাঁচু।

হিমি - দামিনীর নাতিন। বিলাসের প্রেমিকা।

এছাড়াও অনেক অপ্রধান চরিত্র রয়েছে যেগুলি উপন্যাসকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করেছে। চরিত্র ও তার নামকরণে ঔপন্যাসিক যে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তা সহজেই অনুমেয় হয়। সাধারণত গ্রামেগঞ্জে যে ধরনের নাম রাখার প্রবণতা দেখা যায় বা এক নাম একাধিক জনের হয়ে যায়- এই দিক গুলো ' গঙ্গা' উপন্যাসেও বিশেষ লভ্য।

যে ভূখণ্ড নিয়ে একটি আঞ্চলিক উপন্যাস গড়ে উঠে সেই অঞ্চলের ভাষাই ঔপন্যাসিক তাঁর রচনায় তুলে ধরতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। একটি অঞ্চলের ভাষায় মিশে থাকে সেই অঞ্চলের নিজস্বতা। তাই আঞ্চলিক উপন্যাসের বয়ানে স্থানীয় ভাষা ও শব্দের ব্যবহার সর্বদাই প্রাধান্য পায়। আর এটি আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমরেশ বসুর দীর্ঘ অধ্যাবসায় ও ক্ষেত্র সমীক্ষার পর রচিত হওয়া উপন্যাস হল 'গঙ্গা'। ফলত এর ভাষা শৈলীনির্মাণে ঔপন্যাসিক যে কোনো খামতি রাখতে চাননি তা উপন্যাস পাঠেই জ্ঞাত হই। উপন্যাসে বর্ণিত ভাষা বাংলা, তবে এই ভাষা গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলের মালো সম্প্রদায়ের জেলেদের কথ্য ভাষা। মান্য চলিত বাংলার সাথে এই ভাষার

পার্থক্য অনেক। এই ভাষা চরিত্রের সাথে যেমন অন্বিত হয়েছে, তেমনি ভাষার কারুকার্যে ও মোড়কেই সাধারণকে অসাধারণ করে তুলেছেন 'গঙ্গা'র কথাকার। উপন্যাসের কথ্য ভাষার একটি দৃষ্টান্ত -

"ধলতিতার রাম মালো বলত নিবারণকে দেখিয়ে, শুনিচি, এমনি ছেল ওয়াঁর মুত্তিখানি। মালোর ঘরের সেই পেত্থম পুরুষ। না, মালো জাতের কথা বলছিনে। এই তোমার সেকালের বাদার মালোদের পেত্থম পুরুষদের কথা বলছি। সে কি আজকের কথা। চোদ্দ পুরুষেরও চোদ্দ পুরুষ আগে। ওয়াঁর কল্যাণেই সমুদ্দুর পারের মালো বংশ বড় হয়েছেলো, ছইড়ে পড়েছেলো। মালোরা ত্যাখন রাজা হয়েছেল দেশের। শুনিচি, দক্ষিণ দে' হেঁটে এয়েছেলেন। হ্যাঁ, সমুদ্দুরের ওপর দে', দিব্যি পা ফেলে ফেলে হেঁটে এয়েছেলেন। দিগম্বর কালো কুচকুচে এক পুরুষ, কোঁচকানো চুল ফণা ধরে আছে কপালের ওপর। গায়ে আর কিছু নেই। হাতে এক মস্ত ক্যাঁচা। ডাঙায় এসে ওঁয়ার বড় বেপদ হল। দক্ষিণ রায়ের রাজ্যি। ছেড়ে কি কথা কয়। ত্যাখন অবশ্যি ধলতিতেও বাদা। আসার পথে নড়ুই হল দক্ষিণ রায়ের চেলাদের সঙ্গে। জিতলেন উনি। দক্ষিণ রায় খুশি হয়ে মস্ত একখানি গায়ের ছাল দিলেন ওঁয়াকে পরতে। ওই হল ওঁয়ার আসল মুত্তি। বাঘের - ছাল - পরা, ক্যাঁচা - হাতে কালো কুচকুচে পুরুষ। তোমার গোটা সমুদ্দুরের পার ধরেই ছেল ওঁয়ার রাজ্যি।"[৬]

তাছাড়াও মাছমারাদের নিজস্ব কথোপকথনের অনেক শব্দ সরাসরি সমরেশ বসু উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। যদিও তিনি এগুলো উপন্যাসের অভ্যন্তরে ব্যবহারের সময় পাঠককে বুঝিয়ে দিতেও চেষ্টার খামতি রাখেননি। কিছু শব্দ এমন - কুতঘাট (নৌকার মাপ করা হয় যে ঘাটে), সাইদার (সমুদ্রগামী নৌদলের সর্দার), শাবর (মাছমারাদের নৌকার ঝাঁপ), তিবড়ি (মাছমারাদের নৌকার উনুন), গোনে ও বেগোনে (জোয়ারে ও ভাটায়), বাছার (মাছমারাদের সম্মান সূচক খেতাব), সাজার (মাছমারাদের গঙ্গাপূজা), দখনে বাওড় (সমুদ্রে ঝড়), মেকো (কাঁকড়ার বাচ্চা), ভারী গোন (সমুদ্রে প্রবল বান), আগনা (জোয়ারের আগমন), চক (মাছের ঝাঁক), বিনজাল (বাঁশের জাল) প্রভৃতি।

"'গঙ্গা'[১৯৫৭] সেই সমগ্রতার সন্ধানে আর- একপদ অগ্রসর রচনা, যদিও তিতাসের শান্ত নিয়তি বা অদৃষ্টবোধ জনিত উদাসীন শ্রী থেকে তা বঞ্চিত। কিন্তু এও স্মরণীয় যে সমরেশ বসুর লক্ষ্য তা ছিল না। নদীসূত্রে গ্রথিত অদৃষ্ট তিতাসের কাহিনীতে মূল্যবোধ হিসেবে কাজ করেছে। নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ 'গঙ্গা'র মূল চেতনা। সমরেশ বসু কাহিনীর শেষার্ধে এই মৃত্যুবোধকে স্তিমিত করে এনেছেন হিমির খাতিরে। যতক্ষণ তা করেননি ততক্ষণ গঙ্গার খরস্রোতের সঙ্গে সেই মৃত্যু- চেতনাকে

মিলিয়ে উপন্যাসের ঈপ্সিত গতিতে শিল্প সাফল্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বিলাস সমরেশ বসু সাহিত্য- জীবনের তো বটেই, পঞ্চম - ষষ্ঠ দশকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র - সৃষ্টিগুলির মধ্যেও অন্যতম।"[৭]

'গঙ্গা' উপন্যাস সম্পর্কে অবতারণা করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট আলোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মন্তব্যটি থেকেই স্পষ্ট হয় এই উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ কতটা সচেতনতার সাথে করা হয়েছে। কিছু কিছু উপন্যাস যেমন বিষয় প্রধান হয়, তেমনি এমন উপন্যাসও দেখা যায় যেখানে চরিত্র-ই প্রধান। অর্থাৎ উপন্যাসে যা ঘটাবার তা ঐ চরিত্র-ই করবে। কাহিনি এখানে খুব প্রাধান্য পায় এমনটা নয়! কিন্তু যেখানে একটা উপন্যাস একটা সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে, একটা সম্প্রদায়কে, একটা জীবিকাকে তুলে ধরে, সেখানে বলিষ্ঠ চরিত্রের উপস্থাপন কাহিনি-ই দাবি করে। তাই লেখকের জীবন দৃষ্টি, উপন্যাসের থিম ও কাহিনির গতি সঞ্চারে চরিত্র বিশেষ সহায়তা করে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র-ই আঞ্চলিক। জাতীয় বা আন্তর্জাতিকতার টান কোনো চরিত্রে-ই লক্ষণীয় হয় না। প্রত্যেকটি চরিত্র নিজের কথা বলতে গিয়ে আখেরে সমাজের পটচিত্র অঙ্কন করেছে; যা গঙ্গার সমাজচিত্রকে পাঠকের কাছে সহজ ও সরল করে তুলেছে। কোনো চরিত্রকে জটিল করেননি ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু। প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখেই ঔপন্যাসিক প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে জীবন ও জীবিকার সংগ্রামকেই ধ্বনিত করেছেন।

উপন্যাসের শুরুতেই যার কথা পাওয়া যায় সে নিবারণ দাস। সাইদার নিবারণ। ডাকাবুকো মালো মাছমারা। সাগর সঙ্গমে তার নেশা থেকেই তো উপন্যাসের সূচনা। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলেও নায়ক কিন্তু নিবারণ নয়। উপন্যাসে সমুদ্রে যাওয়া নৌদলের সর্দার নিবারণ। অত্যন্ত সামাজিক ও কর্তব্য পরায়ণ একটি আদর্শ চরিত্র। দক্ষিণে যাওয়ার অবাধ্য নেশা তাকে অসময়ে মৃত্যুর কোলে নিয়ে গেছে। উপন্যাসে নিবারণের মৃত্যু চিত্রে ঔপন্যাসিকের কিছুটা আকস্মিকতার টান বিশেষ ভাবে ধরা পরেছে। উপন্যাস মধ্যে নিবারণ চরিত্রের মহানুভবতা দেখা গেছে একধিক অংশে -

"অর্থাৎ পাঁচুর মেয়ে হয়েছে। নিবারণের কিছু হয়নি। ওদিকে ডানসার মুখে দক্ষিণের যাত্রীরা ছটফট করছে।

উপায় নেই। নিবারণ নিজেই হাল কাত করে চাড় দিল।

পাঁচু বলে উঠল, আর এক দন্ড দেখে যাই।

নিবারণ সাইদার। তাকে সব দেখাশোনা করতে হবে গিয়ে। সবাই যাত্রা করে বসে আছে। উপায় নেই। বলল, এট্টা যখন বেইরেছে, আর এট্টাও বেরুবে। দু- দন্ড আগে আর পরে। কিন্তুন আর দেরি করা যায় না। লোকগুলান ভাবনায় পড়ে গেছে।"[৮]

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাস। কেউ কেউ বলেন তেঁতলে বিলেস। উপন্যাসের শুরুতে এই চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। নিবারণ সাইদারের ছেলে বিলাস। সেও বাবার মতোই মাছ ধরায় ওস্তাদ। জীবিকার বাস্তবতায় যেখানে ভাত- কাপড় গঙ্গার ঘোলা জলে বাধা, সেখানে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে বিলাস। এরই মাঝে তার জীবনে আসে দামিনীর নাতিন হিমি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিলাসকে যদি 'গঙ্গা' উপন্যাসের পরিপূরক বলা হয়, তবে তার পরিপূরক হল হিমি। বিলাসকে সমুদ্র হাতছানি দেয়। সেও বাবার মতো দক্ষিণে গিয়ে মাছ ধরতে চায়। মহাসমুদ্র তাকে বারংবার হাতছানি দেয়। বিলাসকে কোনোভাবেই আর আটকানো সম্ভব হয় না। সে সাইদার হয়ে নৌদলের নেতৃত্ব দেয়। নিবারণের পরবর্তী প্রজন্ম হলেও, পাঠকের কাছে বিলাস চরিত্র এমনভাবেই উপস্থাপন করেছেন সমরেশ বসু যেনো মনে হয় নিবারণ- ই আবার ফিরে এসেছে বিলাশ চরিত্রে-র মাধ্যমে। কিন্তু এখানে কোনো ফ্ল্যাশব্যাকের প্রসঙ্গ নেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন -

"বিলাস প্রাচীন রক্ষণশীলতার নিয়ম- সংযমকে ছিন্ন করিয়া নিজ অসংস্কৃত হৃদয়াবেগকেই প্রাধান্য দিয়াছে। হিমির সঙ্গে তাহার প্রণয়োন্মেষের কাহিনী চমৎকার পরিবেশ-ও-চরিত্র-অনুযায়ী অভিব্যক্তি পাইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর দৃঢ় চরিত্র ব্যক্তির মনে প্রেমের আবেগের মন্থর, সংস্কারের বাধাতিসারী সঞ্চার সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সে হিমিকে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার আত্মমর্যাদা ও জাতি সংস্কারকে ক্ষুন্ন না করিয়া। তাহাড় খুড়ার মৃত্যুকালের অনুমোদন এই বিসয়ে তাহাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি- গ্রহণে সহায়তা করিয়াছে। এই বলিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে কোনো সূক্ষ্মতর ভাববিলাস নাই, আছে দেহ - মনের একটা অপ্রতিরোধনীয় যুগ্ম আকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত হিমি স্থলচর প্রাণীর জল সম্বন্ধে যে একটা ভীতি আছে, তাহারই প্রভাবে জলচর প্রণয়ীর সান্নিধ্য পরিহার করিয়াছে। বিলাসও তাহার মানবী প্রণয়িনীর হৃদয় রহস্য পরিমাপে হার মানিয়া আরও অতল রহস্যভরা সমুদ্রের আহ্বানকে স্বীকার করিয়াছে। এই দুইটি, প্রয়োজনের আকর্ষণে সম্মিলিত নর- নারীর স্বল্পকালস্থায়ী প্রণয়লীলা সূচনা হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত অভ্রান্ত ভাবসংগতির সহিত উহাদের আদিম জীবনবোধের নিখুঁত ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে।"[৯]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আলোচনা থেকেই বোঝা যায়, উপন্যাসে বিলাস এবং হিমি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। উপন্যাসে হিমির উপস্থিতি লক্ষ করা যায় প্রায় মাঝামাঝি অংশ থেকে। হিমিকে উপন্যাসে এনেছেন ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সুকৌশলে। কিন্তু বিলাস সম্পর্কে সমরেশ বসু লিখেছেন, যা থেকে তার চরিত্রের অতল খুঁজে পাওয়া যায় -

"বিলাসের বড় শহরের টান। বেড়নে গালাগালে তার শেষ হয়নি। দুবারের দুই পাকে তৃষ্ণাটা বরং বেড়েছে বিলাসের। শহরে থাকবার যে সাধ আছে

বিলাসের, তা নয়। শহরের মানুষের উপর তো তার টান নেই। আপন- জন নেই, টানবে কে। শহর ঘেঁটে দেখবার বড় শখ। তা সে হবার জো নেই। বলে, ছেলে বকে যাবে। খেতে হবে মাছ মেরে, তার আবার অত শহর- টান কিসের।

মাছ মারতে জানে বিলাস। অনেক কিছু জানে। সমুদ্রেও ঘুরে এসেছে দুবার এর মধ্যে। তাও অনেক করমকষ্যি করে। ওই যে, বাপ মরেছে সমুদ্রে। বাপ মরেছে তো ছেলের আর সমুদ্রের ধারে কাছেও যেতে নেই। তবে কি, তোমাদের হাতে পুতুল হয়ে থাকতে হবে নাকি। শহর দেখব না, সমুদ্রে যাব না। রাজা হয়ে গেলুম আর কি।"[১০]

অত্যন্ত নির্ভীক ও প্রতিবাদী চরিত্রও বলা যেতে পারে বিলাসকে। উপন্যাসে বিলাসের কাকা পাঁচুর মৃত্যু তাকে দুটি ছাড় পত্র দিয়েছে প্রথমত, হিমিকে জীবনসঙ্গী করার অনুমতি এবং দ্বিতীয়ত, সমুদ্র স্বপ্নের মুক্তি। উপন্যাসে বড় দাদা নিবারণের অনুসারী ভাই পাঁচু। বলা যায় প্রায় সম্পূর্ণ উপন্যাসের কথক এই পাঁচু। দাদার মৃত্যুর পর ভাইপো বিলাসই তার একমাত্র ভরসা। কিন্তু পাঁচুর মধ্যে দাদা নিবারণের কোনো গুণই নেই। ব্যক্তিত্ব বা দুঃসাহস, দূরাভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনো মনোবলই তার নেই। পাঁচু তার চেয়ে নিজের আখের গোছানোর কাজটা অনেক ভালো পারে। উপন্যাসে দামিনীর নাতিন হিমিকে প্রথম দেখার মুহূর্তটি বিশেষ ভাবে খচিত -

"কোমরে হাত দিয়ে এসে দাঁড়াল নাতনী দিদিমার সঙ্গে। পাঁচুর মনে হল বয়সকালের দামিনীকে দেখছে সে। অবশ্য, ওই বয়সের সময় সে দামিনীকে দেখেনি কোনদিন,তবে ছায়াখানি রয়েছে।

হিমি ভ্রু কুঁচকে তাকাল খুড়ো- ভাইপোর দিকে।

দামিনী বলল পাঁচুকে, আমার নাতীন, বুইলে দাদা। অ্যাদ্দিন আমাকে দিয়েছ, এবার আমার নাতনীকে দিও। দুদিন কাজকারবার করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। একে অপরের সুখ- সুবিধে দেখবে। তোমরা ছাড়া আমরা নই, আমরা ছাড়া তোমরা নও।

পাঁচু হাসল। সারা মুখে ঢেউভাঙা উপকূলের সর্পিল দাগ। পুরু ঠোঁট দুটি ফাটা-ফাটা। জল বাদা সমুদ্র বোঝে। শহরঘেঁষা ডাঙার মানুষের সবটুকু ঠাহর করতে পারে না! একদিন দামিনীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। তবে, সে ছিল ফড়েনী। দামিনীর নাতনীকে ঠিক তেমনটি লাগছে না। তা হবে হয় তো। দামিনীর নাতনী একটু অন্যরকম। মানুষ তো সবাই সমান হয় না।

হিমি ভ্রু কুঁচকে বলল, দি-মা এ বুঝি তোর সেই বসিরহাটের লোক।

দামিনী বলল, হ্যাঁ।

পাঁচু বলে উঠল, হ্যাঁ, তা সে বসিরহাটেরও বলতে পার। ওই তল্লাটেরই

লোক আমরা। আমরা ধলতিতের লোক।

হিমি তাকাল বিলাসের দিকে। তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আবার তাকাল। নাকের নাকছাবিটি বোধ হয় কেঁপেও উঠল বার দুয়েক।"[১১]

উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র একই অভিমুখের যাত্রী। কারণ জীবন স্থল এক, জীবিকার সন্ধান এক, সমস্যা ও উত্তরণ এক, প্রাপ্তি ও হতাশা গুলোও এক। খুব জটিল বা কুটিল চরিত্র সমরেশ বসুকে এই উপন্যাসের প্রয়োজনে সৃষ্টি করতে হয়নি। বরং দামিনীর মুখে কিছু কিছু জটিল কথা শোনা গেছে। এছাড়া সয়ারাম, দুলাল প্রত্যেকটি চরিত্র-ই চালিত হয়েছে আঞ্চলিক বোধ ও নিজস্বতাকে কেন্দ্র করে। গঙ্গার সূক্ষাতিসূক্ষ ইতিবৃত্ত যেনো পাঠককে বাস্তব গঙ্গায় নামিয়ে নিয়ে যায় চরিত্রের সাথে নদী থেকে মহাসমুদ্রের দিকে। এই দক্ষতার বলে সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যে শুধু 'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্যই বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, একথা অনায়াসেই বলা যায়।

জেলে জীবনের সংগ্রাম অস্ত্রহীন সংগ্রাম। কেননা অজানাকে নিয়েই তাদের এগিয়ে যেতে হয়। পেটে খিদে, জলে ভয় নিয়ে নয় বরং জলকে জয় করাই তাদের কাছে এক সংগ্রাম। কিন্তু এই পথে কারো ভরসার আশা তেমন নেই, ফলত লক্ষ্যকে এক ও অভিন্ন করে একাই পাড়ি দিতে হয়। যেখানে পথ চেয়ে বসে থাকে মৃত্যু। ঝড়- ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে জীবনের বুকে হাসি ফুটিয়ে তোলার সংগ্রাম সমরেশ বসু বহু কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্ণনা করছেন। আবার সমানভাবে জেলে জীবনের করুনণচিত্রকেও পাশ কাটিয়ে যাননি -

"নৌকা নিয়ে ভেসে গেল একলা। চকের পিছন পিছন হারিয়ে গেল বাঁকের মুখে। ঠাহর করে দেখেছে পাঁচু, চকভাঙা বাটা মাছের দঙ্গল ভেসে চলেছে জোয়ারের টানে। একলা একলা পেছন ধাওয়া করে, ওই মাছ কোণঠাসা করা কি চাট্টিখানি কথা। কিন্তু কে বলবে। না পারলে, ঘুরে এসে শুয়ে থাকবে চুপচাপ। খেতে বসে দুষবে খালি পাঁচুকে। কেন, না, ভাত কম, পেট কিছুতেই ভরে না। ভাবখানা যেন পাঁচু বেশি খেয়ে ফেলেছে।

আর দশজন খেতে বসল। কিন্তু ভালো লাগে নাকি খেতে। রাঁধলে দুটি মানুষের জন্যে। বেড়ে বসতে হল একজনের ভাত।"[১২]

গঙ্গার বুকে থেকেও সমুদ্রের প্রতি টান উপন্যাসের একটি আশ্চর্য অভিমুখ। এই টান জন্মেছে মূলত মাছমারা জীবনের নিত্য দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার ইচ্ছা শক্তি থেকেই। উপন্যাসে নিবারণ ও বিলাস দুটি চরিত্র-ই মহাসমুদ্রের নেশায় মত্ত হয়েছে। পাড়ি জমিয়েছে অজানায়। আসলে উপন্যাসের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে সমুদ্রের টান এক আন্তর্জাতিকতার হাতছানি। আর এই টান সমরেশ বসুর চরিত্রেরা উপেক্ষা করতে পারেনি। আর এখানেই কাহিনি লাভ করেছে অনেক বেশি দৃঢ়তা। অজানা সমুদ্র

কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা- দুই মুখ্য চরিত্র নিবারণ এবং বিলাসের মধ্যে স্থায়ীরূপে দেখান নি ঔপন্যাসিক। যেমন বিলাসের সমুদ্রে যাওয়ার প্রসঙ্গে উপন্যাসে আকস্মিকতা দেখা যায় -

" তারপর হঠাৎ যেন মাথা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল, খুড়ো সমুদ্রে যাব আমি এবার টানের মরশুমে।

- কী বললি! হাল বেঁকে গেল। জল বাড়ন্ত। চলন্তার চলকায় ধুয়ে যাচ্ছে গলুই। বেগে বাতাস এল দক্ষিণ থেকে। এমন করে তো কোনোদিন বলেনি বিলাস ।

- সমুদ্রে যাবি?

- হ্যাঁ, সমুদ্রে যাব।

- তবে কি সকল মানুষের এদ্দিন ধরে তোর সঙ্গে মশকরা করেছে? যাওয়া তোর বারণ আছে না।

- মারব মাছ, তার আবার বারণ। আমি মালো।

কিন্তু পাঁচুর কুটোকুটি মুখখানিতে রাশি রাশি পুঁয়ে যেন কিলবিল করে উঠল। চোখে দেখা দিল রক্ত। বলল,- বুসইছি শোরের লাতি, মেয়েমানুষের জন্যে তুই বিবাগী হতে চাইছিস।

- মেয়েমানুষের জন্যে?

- হ্যাঁ। ওই রাঁড়ের মেয়ের জন্যে।

- না। ভগবতীর মেয়ে এলেও, সমুদ্রে যাব খুড়ো। গঙ্গায় আমার মন মানছে না আর।

পাঁচু দেখল, বিলাসের বিশাল কালো শরীরে ঢেউ লেগেছে সমুদ্রের। গঙ্গা ওকে ধরে রাখতে পারছে না। বুকের মধ্যে বড়ো ধুকধুক পাঁচুর। তবু চীৎকার করে উঠল, সাবধান- গেলে তোর অকল্যেন, সোমসারের অকল্যেন। সবাইকে তুই পাণে মারতে চাস রে যম কমনেকার।

বিলাস যেন কোনো এক ভাবের ঘোরে গলা চড়িয়ে বলল,আমার বাপ গেছে, তার বাপ গেছে, তুমি গেছ খুড়ো। মাছ মারি আমি, আমি সাগরে যাব।"[১৩]

গঙ্গা নদীর সাথে বয়ে চলা জেলে জীবনে যেমন টান লাগে তেমনি টান লাগে তার তীরে। একূল ভাঙে আর ওকূল গড়ে দেয় গঙ্গা তার নিজ মহিমায়। কারো যায়, কারোবা আসে। এভাবেই জীবন তার গতি পায় ওই গঙ্গার স্রোতেই -

"টান রয়েছে, খুব টান জলে। বড় সহজ পাত্রী ভেব না এই ভগবতীকে। একটু পুব ঠেসেই যাও। জল পানের শব্দ টের পাবে, পশ্চিমে মাটি খাচ্ছেন। একটু একটু করে, ধীরে ধীরে। বছরে বছরে দেখছ, পশ্চিমের কোল বিস্তার

করছে। এদিকে কম। বেশী খাচ্ছে চন্দননগরের উওর চুঁচড়োয়, হুগলীতে।"[১৪]

উপন্যাসের মূল সুর বেঁধেছেন ঔপন্যাসিক মৃত্যু চেতনায় নয়, আঞ্চলিকতায়। উপন্যাসে সমরেশ বসু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (জেলে, কৈবর্ত, নিকিনি, চুনুরী) কথা যেমন এনেছেন; তেমনি জায়গার নামেও (ঠাকরুন, পিয়ালী, বিদ্যাধরী, ইছামতী, রাইমঙ্গল, কালিন্দী) আঞ্চলিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে। জেলে জীবনে জালের বৈচিত্র্য কতটা তাও ঔপন্যাসিক অত্যন্ত নিপুণ হাতে সাজিয়েছেন। আঞ্চলিক উপন্যাস হলেও গানের ব্যবহার বা জেলেদের নিজস্ব গানের কোনো ব্যবহার করেননি ঔপন্যাসিক। শুধু বিলাসের মুখে একটি গান সংযোজিত হয়েছে। তাই সমস্ত বিষয়ের তুল্যমূল্য বিশ্লেষণে একথাই স্পষ্ট হয় 'গঙ্গা' শুধু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি উপন্যাসই নয়, জেলে জীবনের সুখ- দুঃখ, আশা- হতাশার এক পূর্ণাঙ্গ দলিল। 'গঙ্গা' উপন্যাসের অন্যবদ্য শিল্পরূপ, ফলত শিল্পসিদ্ধির প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে এতটাই উচ্চ মানের, যে তা একবার নয়, বারংবার আলোচিত হবার দাবি রাখে ।

তথ্যসূত্র

১. সুধাংশুশেখর মন্ডল : ২০১৬ : ২৮
২. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ২০২০ : ৪১৫
৩. সমরেশ বসু : ২০১৬ : ১৮
৪. তদেব : ১৯-২০
৫. তদেব : ৯৪
৬. : ২০১৬ : ১৪
৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ২০১৬ : ৩২২
৮. সমরেশ বসু : ২০১৬ : ৬
৯. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ২০২০ : ৪১৫
১০. সমরেশ বসু : ২০১৬ : ২৩
১১. তদেব : ৮৪-৮৫
১২. তদেব : ১০
১৩. তদেব : ১২৪
১৪. তদেব : ৬৩

সহায়ক গ্রন্থ

১. সমরেশ বসু, ২০১৬, গঙ্গা, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা

২.সুধাংশুশেখর মন্ডল, ২০১২, সাহিত্যের রূপভেদ রূপরীতি নির্ণয়, গ্রন্থ বিকাশ, কলিকাতা

৩. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২০, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৬, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

৫. দেবেশ রায়, ২০১৬, উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০১৭, কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

৭. সুভাষ দাস (সম্পা), ২০১৯, আরশিনগর, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন

চন্দন আনোয়ারের পোড়োবাড়ি ও মৃত্যুচিহ্নিত কণ্ঠস্বর গল্পগ্রন্থে সমাজ ও রাজনীতি

জাকিয়া রহমান

বিশ্বায়ন, নগরায়ন, সভ্যতার নবরূপায়ণ ও পুঁজিবাদের আগ্রাসনে ক্রমেই মানবতা ভূলুণ্ঠিত। ক্ষয়িষ্ণু মানবিকতার ধূলিধামে ক্ষমতার লড়াই যেন রাজনীতির পাশাপাশি সমাজ জীবন, ব্যক্তি জীবনকেও গ্রাস করেছে। কার্ল মার্কসের পুঁজিবাদ, মিশেল ফুকোর ক্ষমতায়ন তত্ত্ব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে; পুঁজি এবং ক্ষমতার আগ্রাসী প্রভাব মানুষের মূল্যবোধ ও সমাজ জীবনকে কীভাবে করেছে জরাগ্রস্ত। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সর্বস্তরের মানুষের বিশেষত মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম ও সে সংগ্রামের নিয়ন্ত্রক হয়েছে পুঁজিবাদ ও ক্ষমতার কালোছায়া। সমসাময়িক যুগযন্ত্রণা ও যাপিত জীবনের হাহাকার, শূন্যতা এবং মানবিকতার অবক্ষয় একজন সমাজ সচেতন কথাসাহিত্যিকের কলমে বাণী ভঙ্গিমায় নিজস্ব অবয়ব লাভ করে। বুঝিবা কথাসাহিত্যিক চন্দন আনোয়ার সে পথের অনুসারী লেখক। একবিংশ শতকের প্রথম দশকের এই লেখকের গল্পের মূলবিষয় হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যুদ্ধাপরাধীর বিচার, পুঁজিবাদ, নারী-পুরুষের মনঃসমীক্ষণ, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন সংগ্রাম তথা সমকালীন সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তব সত্যচিত্র। ‘প্রথম পাপ দ্বিতীয় জীবন’ গল্প গ্রন্থের মাধ্যমে গল্পকার হিসেবে ২০১০ সালে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তী গল্পগ্রন্থ ‘অসংখ্য চিৎকারে’(২০১২)-এ লেখক যেন একটু বেশীই পরিণত। তাঁর পরবর্তী গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-'ত্রিপাদ ঈশ্বরের জিভ’ (২০১৭), 'পোড়োবাড়ি ও মৃত্যু চিহ্নিত কণ্ঠস্বর (২০১৪)', 'ইচ্ছামৃত্যুর ইশতেহার (২০১৮)', 'আঁধার ও রাজগোখরা’ (২০২১)। কলকাতার একুশ শতক প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে 'নির্বাচিত ৩০' নামে ত্রিশটি গল্পের সংকলন। এছাড়া অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০২১ এ উল্লেখযোগ্য পঞ্চাশটি গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগ্রন্থের অনুরূপ লেখকের প্রথম উপন্যাস 'শাপিত পুরুষ' অপেক্ষা দ্বিতীয় উপন্যাস 'অর্পিত জীবন’ (২০২০) অধিক চমকপ্রদ রচনা।

জীবনের সার্বিক রূপায়নই সাহিত্য সৃষ্টির মূল রসদ। জীবনের

জাকিয়া রহমান
প্রভাষক,বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কোর্ট কলেজ, রাজশাহী
এম,ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

সাথে সম্পৃক্ত সমাজ, ধর্ম, দেশ, স্বাধীনতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, মূল্যবোধ ও মানবিকতা। যাপিত জীবনের দায় থেকে যে শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তার সাথে অবলীলায় উঠে আসে জীবন ও সমাজ বাস্তবতার অনুষঙ্গ এবং রাজনৈতিক শোষণ-পীড়নের চিত্র। লেখক চন্দন আনোয়ারের গল্পের বিষয়বিন্যাস ও আখ্যান বিশ্লেষণে দৃষ্টিগোচর হয় 'মা ও ককটেল বালকেরা', 'করোটির ছাদে গুলি', 'গিরগিটি ও একজন মেয়ে', 'মৃত্যু অথবা ঘুম', 'মতি পাইকারের তিনটি প্রশ্ন', 'রুগ্নতার গলি-ঘুপসি', 'আমাদের যুবক নেতা', 'বারবনিতা এসোসিয়েশন', 'একজন দৈবজ্ঞ ও একটি মৃত্যু', 'একটি পুকুর মরে যাচ্ছে','বাড়ন্ত বালিকার ঘর সংসার'- গল্পের অন্তর্গভীরে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নীতিহীনতার চিত্র সরলকাহিনি অথবা প্রতীকায়ণের মাধ্যমে লেখক উপস্থাপন করেছেন। চিন্তার মুক্তি ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বর্তমান বিশ্বে লেখকদের জন্য ভয়াবহ হুমকি স্বরূপ। এও সত্যি, কালোছায়ার দাপুটে হুংকারে সত্যপ্রকাশে অকুতোভয় লেখক জীবনের পরোয়া করেন না। অপশক্তির হিংস্র থাবায় জাতির কলিজা খামছে ধরলে যিনি প্রকৃত লেখক তিনি স্বভাববশত লেখনীর ভাষায় প্রতিবাদ করেন। সঙ্গত কারণেই নিজের লেখক সত্তা সম্পর্কিত সাক্ষাৎকারে কথাসাহিত্যিক চন্দন আনোয়ার বলেছিলেন- "ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমি কিছু করতে পারছি না, কিন্তু প্রতিবাদ তো জানিয়ে রাখতে পারি।"

সমকালীন সকল লেখকই যে তাদের রচনায় প্রতিবাদের অগ্নিমশাল প্রজ্জ্বলিত করে চলেছেন তেমনটিও নয়। যুগে যুগে কালে কালে সকলেই নয়, কতিপয় সচেতন ব্যক্তি অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়ন, নীতিহীনতার বিরুদ্ধে নিজ নিজ অবস্থান ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন। লেখক সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। 'অসংখ্য চিৎকার' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'কবি ও কাপালিক' গল্পটিতে কাপালিক কর্তৃক সত্যপ্রকাশে অকুতোভয় কবিকে হত্যার মতো নৃশংসতা এরূপ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। কাপালিকসম আগন্তুকের জিজ্ঞাসা-

"এবার কণ্ঠের স্কেল ফের একধাপ নামিয়ে মার্কস- এঙ্গেলস-লেনিন-ট্রটস্কি-স্ট্যালিন-মাওসেতুং এইসব নামগুলো একটানে উচ্চারণ করতে করতে অকস্মাৎ উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল, আপনার লেখায় এসব কী থাকে? গণতন্ত্র! সমাজতন্ত্র! জাতীয়তাবাদ! বস্তাপঁচা বাতিল এইসব আইডিয়াকে আমি বা আমরা খানকি বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। হু! এবার কুৎসিত শব্দের বিকৃত হাসি দিল আগন্তুক।" (চন্দন আনোয়ার : ২০১৯ : পৃ. ১১)।

'গিরগিটি ও একজন মেয়ে' গল্পে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রনেতা কর্তৃক নারী ধর্ষণের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ছাত্র নেতার মঞ্চ কাঁপানো ভাষণ- "শিক্ষাসন্ত্রাস একসাথে চলবে না! পিস্তল-কলম একসাথে চলবে না!" (তদেব : পৃ. ৫১)।

আমলা,নেতা সমাজপতির এরকম ভাষণে মশগুল সমাজের অবকাঠামো, দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়ী লেখক চন্দন আনোয়ার দুঃসাহসিকতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টিকে তিনি গল্পে স্থান দিয়েছেন। ঘৃণায় ক্ষোভে পুরুষের ধর্ষকামিতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। ধর্ষিতার পায়ের চাপে ধ্বংস করেছেন পুরুষের পৌরুষত্বের অহংকার। ছাত্রনেতার রাতভর নারী ধর্ষণ ও ছাত্রসমাজের বিপথগামিতায় গল্পে হতবিহ্বল লেখকের আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে-

"সকালে এরাই মিছিল বের করবে- শিক্ষা-সন্ত্রাস একসাথে চলবে না! পিস্তল-কলম একসাথে চলবে না! বায়ান্ন, চুয়ান্ন, ছেষট্টি, উনসত্তর, একাত্তর, নব্বই- ওরা কারা আর এরা কারা? এত পতন! এত পচন! কারা করল এত বড় ক্ষতি? দেশটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? মেয়েটা কোথায় দাঁড়াবে?" (তদেব : পৃ. ৫৩) ।

অসংখ্য চিৎকার গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মা ও ককটেল ককটেল বালকেরা', 'করোটির ছাদে গুলি' এবং 'পোড়োবাড়ি ও মৃত্যুচিহ্নিত কণ্ঠস্বর' গল্পগ্রন্থের 'আমাদের যুবক নেতা' আলাদা আলাদা পূর্ণাঙ্গ গল্প হয়েও যেন রাজনৈতিক নেতা তৈরীর ধারাবাহিক আখ্যান হয়ে উঠেছে। এই গল্পগুলোতে লেখক নিশঙ্কচিত্তে অবগুণ্ঠন মুক্ত ভাষায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের স্বরূপটি শেকড়সহ উপড়ে ফেলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সমকালীন রাজনীতি চর্চার মতাদর্শ হয়েছে গল্পের বিষয়। জনকল্যাণ নয় পুঁজি বিহীন লাভসর্বস্ব ব্যবসাই যেন সমকালীন রাজনীতি। সঙ্গত কারণেই 'করোটির ছাদে গুলি' গল্পে কিশোর মুকুরের মুখে ধ্বনিত হয়-"সব ইস্তফা দিয়ে এখন ইনকাম এর শর্টকাট লাইন। পলিটিক্স। এই লাইনে এক টাকাও পুঁজি লাগে না। লাভ আছে, লোকসান নেই।" (তদেব : পৃ. ৩৫)।

অভাব দারিদ্র্যের জর্জরিত মোকাদ্দেস আলী বা মুকুরের চোখে যেন সমকালীন রাজনীতি সুস্পষ্ট। এই চরিত্রটি কে বলতে শুনি- "পলিটিক্স মানে সিঁড়ি ভাঙার খেলা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আশা নিরাশার খেলা! লাভ-লোভের, হিংসা-প্রতিহিংসার খেলা!" (তদেব : পৃ. ৪৩)। এরই ধারাবাহিকতার যুবক নেতার পরিণত ও কৌশলি উক্তি, "লেখাপড়াই কি সব গ্রাম বাঁচাতে হবে না? গ্রামের উন্নয়ন কে করে?... গ্রামে ফিরে আর অপেক্ষা করে নি। বাবার টাকার ক্লাব চালিয়ে পার্টির নাম জুড়ে দিল। গ্রাম উন্নয়নের একটা সহজ উপায় বটে। তবে শহরে একেবারে ছাড়া যাবে না, পলিটিক্সের আখড়াই ..." (চন্দন আনোয়ার : ২০১৪ :পৃ. ৫৯)।

কথাকার চন্দন আনোয়ারের 'অসংখ্য চিৎকার' গল্পগ্রন্থের 'মা ও ককটেল বালকেরা' গল্পের বালক আইনা ও কিশোর মকু চরিত্রের পরিণত রূপ অবলোকন করি যুবক নেতার চরিত্রে। আইনা, মকু চরিত্রের পরবর্তী ধাপে 'আমাদের যুবক নেতা' গল্পে পরিণত বুদ্ধির যুবক নেতা পাই। হয়ত পরবর্তী গল্পগ্রন্থে এই যুবক নেতাই দক্ষ বর্ষীয়ান নেতায় পরিণত হবে। এই

সকল যুবক নেতাই দেশ ও ক্ষমতার কর্ণধার যারা শুধু নিজেদের ফায়দা লুটতে ব্যস্ত। গ্রাম উন্নয়নের দোহাই দিয়ে সর্বসম্মুখে ব্যক্তির উন্নয়ন ঘটায়। শিক্ষাযুদ্ধে পরাজিত সভ্যতার আলোহীন যুবক কেমন করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছায়? জ্ঞানের আলোবর্জিত বর্বর নেতার দ্বারা খুন, ধর্ষণ, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মজুতদারী, মাদক ব্যবসা এমন কোন অন্যায় নেই যা করা সম্ভব নয়। এ গল্প তারই আখ্যান।

পুঁজিবাদ ও দারিদ্র্যের ভয়াল কষাঘাত ও জীবনবাস্তবতা নিয়ে রচিত গল্পগুলোর মাঝে অন্যতম গল্প 'পাঁচ শ টাকার নোট'। নিম্নবিত্তের মানুষের চলমান জীবন জটিলতাকে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ গল্পের বিষয়বস্তু করেছেন। সমাজের নিচুঁ শ্রেণির অশিক্ষিত সুবিধা বঞ্চিত নিরীহ নোয়াব আলির জীবন যুদ্ধের গল্প 'পাঁচ শ টাকার নোট'। ফ্লাশব্যক পদ্ধতিতে গল্পের সূচনা। এ গল্পের সূচনাতেই পাই পেটের দায়ে নোয়াব আলীর স্ত্রী তমিজা খাতুনের দেহ বিক্রির চিত্র। হাতের মুঠোয় কড়কড়ে পাঁচ শ টাকার নোট নিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে কি বিধাতার কাছে মাপ চেয়ে নিল? তা নাও হতে পারে। হতে পারে পাঁচশ টাকা রোজগারের জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ দিল। আজ থেকে ছেলে দুটার মুখে গরম ভাত তুলে দিতে পারবে ভেবে। নিষ্ঠুর জীবন ও জীবিকার তাগিদে ইচ্ছের বিরুদ্ধে এমনতর কাজও করতে হয় তমিজা খাতুনকে। কালোবাজারি, মজুতদার ও পুঁজিবাদ গ্রাস করেছে গোটা বিশ্বকে। সে প্রভাব গ্রাস করেছে নিম্নবিত্ত মানুষের খেয়ে পরে বাঁচার নিশ্চয়তাকে। দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক অথবা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'নয়নচারা' গল্পের পটভূমি স্মরণ হয়। দুর্ভিক্ষের সময় আত্মসম্মান রক্ষা করতে যেয়ে দলে দলে ঘরের ভেতর না খেয়ে শুকিয়ে মরে পড়েছিল অসংখ্য মধ্যবিত্ত মানুষের লাশ। পাঁচ শ টাকার নোট গল্পে ন্যায্যমূল্যের দোকানে তেমনি দেখা মেলে এক মধ্যবিত্ত স্কুল শিক্ষকের যুবতি সুন্দরী মেয়ের। মাত্র তিন টাকা কমে চাল কেনার জন্য ক্ষুধা পেটে ও লজ্জা মুখে নিয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষের সাথে লাইনে দাঁড়িয়েছে। তমিজা খাতুনের আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মকথন : "তোর আসার কি দরকার এখানে? এত ভদ্রলোকের বেটি তুই! তোদের জন্যে তো হাজার হাজার মন চাল থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে আড়তে। দোকানে। কি চাল নিবি? বাসমতি, নাজিরশাহ, মিনিকেট কি কি সব বাহারি নামের, গন্ধের চাল ভদ্রলোকদের জন্যে। " (তদেব: পৃ. ২৬)।

নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শরীরকে লেখক বলেছেন পেটের অসুখ। সত্যিই পেটের অসুখে ভুগছে সারাদেশ। তমিজা খাতুনের মন জুড়ে প্রশ্নের আনাগোনা- "কেন কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ন্যায্যমূল্যের দোকানের লাইনে? কতটা জঠরের জ্বালা হলে তিন টাকা বাঁচাতে একজন স্কুল টিচার তার যুবতী মেয়েকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন? সে নিজে

কেন দাঁড়ায়নি? দাঁড়ালে কার লজ্জা? তার? নাকি তাদের? কার সম্ভ্রম রক্ষা করতে চাইছে সে? তমিজা খাতুনের খুব ইচ্ছে হয় বুড়ো মানুষটাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে একেবারে সব কিছু ন্যাংটো করে দিতে!" (তদেব: পৃ. ২৭)।

এভাবে দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে মধ্যবিত্ত মানুষগুলোও যদি রাস্তায় নেমে আসতো, যদি মিথ্যা লজ্জা আর অহমিকাকে পায়ে মাড়িয়ে ন্যায্যমূল্যের দোকানে নিম্নবিত্তের সারিতে দাঁড়াতো, তাহলে নড়ে উঠতো জনবিচ্ছিন্ন সরকারের ভিত্। ভূ-কম্প শুরু হত রাষ্ট্র নায়কদের একনায়কতন্ত্রের ভূমিতে। মধ্যবিত্তের লজ্জা আর আত্মসম্মানকে পুঁজি করে পুঁজিপতিরা টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে যার প্রভাব পড়েছে এ সাধারণ মানুষগুলোর উপরে।

'বারবনিতা এসোসিয়েশন' নামক গল্পে লীলাবালা নামক বারবনিতা এসোসিয়েশন খুলেছে। গল্পে লেখক দেখিয়েছেন বারবনিতার ঘরে প্রকাশ্যে গেলে সম্মানের হানি ঘটে। আবার রাতের আঁধারে সে সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না। বারবনিতার শরীর হয় অমৃত সমান। এই প্রেক্ষাপটে সম্মান নামক কল্পনীয় বিষয়টির অবয়ব নির্মাণে ব্যস্ত লেখকের কলম। অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতনার কবি কাজী নজরুল ইসলামের "বারাঙ্গনা" কবিতা স্মরণে আসে। বুঝিবা নজরুলের মতো মহৎ হৃদয় ধারণ করে লেখক বারবনিতাকে করেছেন গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। বারবনিতারা বারবনিতা হতো না, যদি না অতি ভদ্র চরিত্রবান পুরুষরা তাদের সংস্পর্শে যেত। পুরুষ জাতি বারবনিতা তৈরি করলেও নিজের কাঁধে সে কলঙ্কের দায় রাখে না, সকল দায় বারবনিতার। বারবনিতারা সমাজে ঘৃণ্য হলেও এ ঘৃণ্য নারীর সুধা পানে সমাজের সকল স্তরের পুরুষের অবাধ যাতায়াত বারবনিতাদের ঘরে। সে দিকটি অনুধাবন করেই হয়ত মানবতার ধ্বজাধারী লেখকের এই গল্প রচনা। ছোট্ট শহর কিন্তু হোটেলের অন্ত নেই। হোটেল ব্যবসাও রমরমা। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, হোটেল মালিকরা এই বারবনিতাদের হাত করে ব্যবসা করে। তাই দেখা যায়, হোটেল বয় কথকের সামনে হাজির করে বারবনিতাদের ক্যাটালগ। বারবনিতাদের ক্যাটালগ থাকতে পারে তা পাঠককে বিস্মিত করে। রেস্টুরেন্ট এর খাবারের মেনুর মতই ক্যাটালগে নারীদের নিজের প্যাকেজ মূল্য নির্ধারণ করা আছে। কী অভিনব কৌশলে লেখক একজন নারীকে পণ্য করে তোলার প্রক্রিয়াটি দেখিয়েছেন! কার্ল মার্কস যেমন দাস প্রথার সূচনায় দেখিয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজে কিভাবে ক্রমানুসারে শোষণের শিকার একজন মানুষ নিজেকে দাস হিসেবে মেনে নেয়। তেমনি একজন বারবনিতাও অর্থের প্রয়োজনে নিজেকে পণ্যে পরিণত করেছে।

লীলাবালার ঘরের দেয়ালে ও কাস্টমার অফিসারের হাতে চাবুকের উপস্থিতি নপুংসকতার বর্বরতাকে নির্দেশ করে। নবাগত কথককে উদ্দেশ্য করে বলা লীলাবালার উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে। "এই শহরে একটাও মরদ নেই! সব নপুংসকের দল! এই শহরের আলো-বাতাস পর্যন্ত শালারা

পেটে ঢুকিয়ে নপুংসক হয়ে গেছে। তুই নতুন আইছিস, দেখি তুই মরদ কি না? নে, তুই চাবুক হাতে নে!" (তদেব: পৃ. ৯৪)।

শহরে অবস্থানরত বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাসহ রাজনৈতিক নেতা সকলেই দুর্নীতির সাথে জড়িত। উন্নয়নের সকল অর্থ নিজে গ্রাস করে ভুঁড়ি মোটা করেছে। লেখক পদস্থ কর্মকর্তাদের সর্বগ্রাসী ভূমিকা তুলে ধরেছেন বারবনিতার মুখে। অযোগ্য এই সকল পুরুষকে অর্থের বিনিময়ে বারবনিতারা ঘরে স্থান দিলেও দেহের লালসা মেটায় চাবুকের আঘাতের নৃশংসতায়। তাই কাস্টমারের হাতে তুলে দেয় চাবুক এবং ধিক্কার দিয়ে গালি দেয় নপুংসক বলে। বারবনিতার এহেন আচরণ ও উক্তিতে মনে হয় লেখক বারবনিতার শরীরে চাবুকের চাপকানির আঘাতের মধ্য দিয়ে এই পুরুতান্ত্রিক সমাজের নপুংসকতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। নপুংসক পুরুষ ও এই নপুংসক সমাজের শিক্ষা-সংস্কার, পৌরুষত্বের অহমিকা, অন্তঃসারশূন্যতায় ক্রোধে কাঁপে লীলাবালার শরীর। প্রতিশোধে প্রতিহিংসায় ও ক্ষোভে দাঁত খিঁচিয়ে কামড়ে ধরে হাতের চাবুক। যেন পুরো সমাজটাকেই কামড়ে ধরেছে লীলাবালা।

আগেকার দিনের রাজা-বাদশাহরা বারবনিতাদের গোলাম হয়ে থাকত। সংসার থেকে রাষ্ট্র শাসন সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ছিলো এই বারবনিতাদের। যুগের বিবর্তনে এদেশের এক রাষ্ট্রনায়কের বারবনিতা নিয়ে মাতামাতিও লেখকের নজর এগিয়ে যায় না। বিজ্ঞ-বিচক্ষণ লেখক মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের সীমা অতিক্রম করে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে গল্প রচনা করেছেন। তবে সামাজিক বিশৃঙ্খলায় এই বারবানিতার দাপট চিত্র সেই রাজা-বাদশাদের সময় যেমনটি ছিল, বর্তমানেও তেমনটিই আছে। শুধুমাত্র আধুনিক পোশাকের মোড়কে এই রীতি একটু আধুনিক ও সভ্য হয়েছে। পূর্বে রাজাগণ প্রকাশ্যে বারবনিতার কেনা গোলাম হয়ে থাকতেন। বর্তমানের পুরুষসমাজ লোক চক্ষুর অন্তরালে এই সব দেহজীবী নারীর সান্নিধ্যে থাকে। এই নারীরা পরোক্ষভাবে দেশ পরিচালনা থেকে শুরু করে অফিস পরিচালনায় পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে রসাতলে যায় ব্যক্তি ও সমাজজীবন। বর্তমান সমাজে ঘটে যাওয়া এ এক জটিলতর সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজ সচেতন লেখকের নজর এড়িয়ে যায় না।

'একজন দৈবজ্ঞ ও একটি মৃত্যু' গল্পটির সরল নামকরণে মূল বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পটিতে লেখক সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে একই থালায় পরিবেশন করেছেন সচেতনতার জ্ঞান। দুপুর রাতে অচেনা নম্বরের কলে হঠাৎ মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। অপর প্রান্ত থেকে ভরাট কণ্ঠে একটি মেসেজ জানায়, "নামাজ পড়েন! নামাজ! আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার আয়ু! " (তদেব : পৃ. ৮৩)।

সুযোগ সন্ধানী, মানসিকভাবে অসুস্থ ধর্মান্ধ কিছু মানুষ মনের খেয়ালে মাঝরাতে অচেনা নম্বরে ফোন দেয়। নিজের বিকারগ্রস্ত মনের চাহিদা অনুযায়ী ফোনের অপর প্রান্তের মানুষের সাথে কথা বলে। এই কথা বলার পরিণাম কত ভয়ংকর হতে পারে বিকারগ্রস্ত কলদাতার তা বিবেচনায় থাকে না। থাকার কথাও নয়। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে এমন ঘটনা বিরল নয়। সে ঘটনার প্রেক্ষিতেই সুমন রহমানের মৃত্যুর আলেখ্য রচনা করেছেন লেখক। পাশাপাশি দেখিয়েছেন ধর্মান্ধ মানুষেরা ধর্মকে পুঁজি করে সমাজে অহেতুক অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টায় লিপ্ত। বর্তমান সময়ে জঙ্গিবাদ ও তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সারাবিশ্ব সংকটের সম্মুখীন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। জঙ্গীগোষ্ঠীকে সমূলে ধ্বংস করতে সচেষ্ট সারাবিশ্ব। সমসাময়িক ভয়ংকর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা গল্পটিতে উঠে এসেছে। 'একজন দৈবজ্ঞ ও একটি মৃত্যু' গল্পটির সরল কাহিনির ভাঁজে ভাঁজে সমাজসচেতন লেখক যাপিতজীবনে ধর্মান্ধতা কী ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলতে পারে তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন।

'একটি পুকুর মরে যাচ্ছে' গল্পের নামকরণ শাব্দিক অর্থে পুকুরের আত্মজীবনী বলে মনে হলেও গল্পপাঠে স্পষ্ট হয় যে, এ গল্পে এমন নামকরণ লেখক রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন। কথাসাহিত্যিক চন্দন আনোয়ার মুক্তিযুদ্ধ, তৎপরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রধান দুই দল কর্তৃক দেশশাসন শোষণের বাস্তবচিত্র অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পটিতে। পাশাপাশি প্রধান দুই দলের শাসন শোষণ ও ক্ষমতার লড়াইয়ে বাংলাদেশের মুমূর্ষু অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন রূপকের অন্তরালে।

লেখক মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং রাজাকার কর্তৃক সাধারণ মানুষ হত্যার চিত্র দেখিয়েছেন ছোট বউ জামিলার রাজাকার ভাইয়ের চরিত্রে। জীবন বাঁচানোর শর্তে রাজাকারের বোনকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় সওদাগর আলি। অন্যদিকে প্রথম স্ত্রী রাহেলা মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে। লেখক অত্যন্ত কৌশলে সওদাগর আলির দুই স্ত্রীকে দুই মেরুতে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ একজন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের এবং অন্যজন রাজাকার পরিবারের মেয়ে। এদের পরিচয় একজন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি অন্যজন বিপক্ষ শক্তি। কালক্রমে এই দুই নারীর পারিবারিক পরিচয় ও তাদের শরীরে বয়ে চলা রক্তের ধর্মানুযায়ী তাদের আচরণে প্রকাশ করেছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশীয় ঘাতকদের হাতে সপরিবারে নৃসংভাবে হত্যার শিকার হলে প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগসহ বাংলাদেশ নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানি আদর্শে অনুপ্রাণিত ওৎপাতা শক্তি ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক দল গঠন করে স্বাধীনতা বিপরীত ও বিকল্প শক্তি হিসেবে তারা আত্মপ্রকাশ করে। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি দীর্ঘদিন মাথা নত করে থাকতে বাধ্য হয়

বিপক্ষ শক্তির কাছে। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে পরে ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে এবং নিজ অধিকার তথা গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই সরকারি দল ও বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এই দুই দল কর্তৃক দেশ ও দেশের ক্ষমতা দখলের আগ্রাসী রাজনীতির সূচনা ঘটে। এ বাস্তবতাকে মূল বিষয় করে রাহেলা জামিলা ও সওদাগর আলি চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক সংসারিক জটিলতার জাল বুনেছেন লেখক। যুদ্ধপরবর্তী এ দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ধারা ও রাজাকার আল বদর আল শামস কর্তৃক আবারও দেশের ক্ষমতা ও রাজনীতিতে ফেরার প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল ঘটে পাঁচ বছর পর পর। অর্থাৎ পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জনগণের ভোট আদায়ের লক্ষে একে অপরকে দোষারোপ করে। নিজেকে সাধুপুরুষ প্রমাণ করে। আর ক্ষমতা হাতে পেলে দেশটাকে ক্রমাগত শোষণ ও লুণ্ঠনে নিঃশেষ করে দেয়। মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় দেশের স্বাধীনতার। গল্পে পুকুরের মালিকানা ও ভোগদখলের প্রতীকি ব্যঞ্জনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে।

'অন্তর্গত শূন্যতা' গল্পটিতে তৃতীয় লিঙ্গের জীবনবাস্তবতার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সমাজ তাদের মানুষ বলে স্বীকার করে না। দৈহিক আকৃতিতে তারা মানুষ কিন্তু অন্তর্গত শূন্যতা বা গোপনাঙ্গের বিকলাঙ্গতা বিকল করেছে তাদের মানব পরিচয়। সৃষ্টিজগতে তারা নষ্ট হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশের মতো। তাই তারা পরিবার ও সমাজবহির্ভূত যন্ত্রণাময় এক জীবনের অধিকারী। দশ মাস গর্ভে ধারণ করা মা-ও সমাজের চাপে শেষ পর্যন্ত তার হিজড়া সন্তানকে অস্বীকার করে। যৌনতার ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে সমাজের স্তম্ভ। যৌনতাই মুখ্য, জীবন গৌণ। তাই যৌন ক্ষমতায় অক্ষম এই মানুষগুলোর প্রাণের স্বীকৃতি নেই সমাজে। এরা জন্মগত শূন্যতার দায় বয়ে বেড়ায় সারা জীবন। তাই স্রষ্টার উদ্দেশ্যে লেখকের জিজ্ঞাসা পাঠকের মনেও সমানভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

"ঠিক বুঝে পাই না, ওদের জন্মাবার কী দরকার ছিল? কী ব্যালেন্স তৈরি করলেন ঈশ্বর? কী করবে ওরা এখানে অর্থাৎ মানুষের চালু সমাজে। যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে জৈবিকতার উপরে, দেহের লেনদেনের উপরে।" (তদেব: পৃ. ৭৩)।

'মতি পাইকারের তিনটি প্রশ্ন' নামক গল্পের পরবর্তী পর্যায় যেন 'আমি কেউ নই' গল্পটি। বুর্জোয়া সমাজের আভিজাত্য ও শোষণের দাপটে ক্ষুদ্র পুঁজির ব্যবসায়ী মতি পাইকার উন্মাদ হয়ে যায়। উ'আমি কেউ নই' গল্পে শফিক পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতায় নিজের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখতে

নৈতিকতাকে বিসর্জন দেয়। তার সম্মতিতে স্ত্রী মহাজনের পুঁজির কাছে জিম্মি হয়ে হয়েছে শয্যাসঙ্গিনী। পুঁজিপতির পুঁজির লোভে নারীর নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার ইতিহাসও বিরল নয়। শুধু স্বেচ্ছাচারীতাই নয় এ গল্পে নারীর স্পর্শ কাতর মনকেও লেখক উপস্থাপন করেছেন। মহাজন বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রতীক এবং নিরক্ষর স্বামী শফিকের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। সঙ্গত কারণে বাধ্য হয়ে শরীর দান করলেও ক্রমে এই নারী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। রীতিমতো মহাজনের প্রেমে ব্যাকুল এই নারীর গৃহত্যাগের বাসনাও মনে উত্থিত হতে দেখা যায়।

"ঢাকায় যাবার নেশা পেয়ে বসেছে। আড়তদারের ময়ূরপঙ্খী খাটে হেলান দিয়ে বিচিত্র বিষয় নিয়ে তর্ক করার নেশা আফিমের নেশার মত আমারে ধরেছে।" (তদেব : পৃ: ১৫)।

'পালিয়ে বেড়ায় বিজয়' গল্পটি অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের লোক দেখানো সম্মান প্রদান বিষয়ক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক রচনা। যুদ্ধে পা হারানো মুক্তিযোদ্ধা রহম আলির আত্মসম্মানবোধ তাকে লোক দেখানো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেয় না। রহম আলীরা স্বাধীনতার যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার সুদীর্ঘ সময়ের পরেও তার প্রতিফলন ঘটে না। উপরন্তু রহম আলী পায় ল্যাংড়া রইস্মা নামক অপমানজনক উপাধি। অভাব দুঃখে জর্জরিত, অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীক রহম আলী। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর মুক্তযোদ্ধাদের কাছে এ ইতিহাস স্বপ্নভঙ্গের, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও গঞ্জনার ইতিহাস।

'ইঁদুর নিধন প্রকল্প' এবং 'পোড়োবাড়ি ও মৃত্যুচিহ্নিত কণ্ঠস্বর' গল্পটিতে যুদ্ধাপরাধীর শাস্তির দাবি উত্থাপন ও তা কার্যকর করা হয়েছে। 'ইঁদুর নিধন প্রকল্প' গল্পে ইঁদুরকে যুদ্ধাপরাধী রাজাকারের প্রতীক হিসেবে লেখক উপস্থাপন করেছেন। 'পোড়ো বাড়ি ও মৃত্যুচিহ্নিত কণ্ঠস্বর' নামক গল্পে লেখক চরিত্রের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন। যুদ্ধাপরাধীর বিচার চেয়ে 'অসংখ্য চিৎকার' গল্পগ্রন্থে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন এ গল্পগ্রন্থে লেখক নির্ভীকচিত্তে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে কতিপয় চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নকে যেন বাস্তবে রূপায়িত করলেন।

'বাড়ন্ত বালিকার ঘর সংসার' গল্পে বাংলাদেশে প্রচলিত অসম বিবাহ তথা মেয়েদের বাল্যবিবাহের ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে। পুরুষশাসিত সমাজে নারী কেন্দ্রিক ভোগবাদী চিন্তার একমুখীনতার ভয়াবহতা এই গল্পের মূল বিষয়। যে অনাকাঙ্ক্ষিত সত্য সমকালীন পত্রিকার পাতাতেও ঝড় তুলেছে। গল্পটি চিরন্তন, মর্মস্পর্শী। পাঠকের হৃদয়ের গভীরে আঘাত করে। এই গল্পের লেখকের সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস গুমড়ে কাঁদে । অনেক মেয়ের বাবা-মা এই আধুনিক সমাজেও অর্থবিত্তের লোভে অধিক বয়সী পুরুষের সাথে তাদের বালিকা কন্যার বিয়ে দিচ্ছে। পরিণামে ঘটছে বালিকার রক্তাক্ত

অকাল অপমৃত্যু। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক সমস্যার অন্তর্গত।

বাস্তববাদী কথাকার চন্দন আনোয়ারের প্রতিটি গল্প যেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনা। অবশ্য উদ্দেশ্যহীন পথচলা লেখকের কাজ নয়। কথার পিঠে কথা, গল্পের প্রয়োজনে গল্প এমন প্রবাদকে প্রশ্রয় না দিয়ে সমকালীন বাস্তবতাকে শতভাগ মূল্যায়ন করে কলম ধরেছেন এই কথার যাদুকর। সঙ্গতকারণেই গল্পগুলো হয়েছে প্রাণবন্ত ও শিল্পোত্তীর্ণ। বাস্তবতা এতে এমনভাবে এসেছে যে পাঠক গল্পপাঠ করতে গেলে গল্পকাহিনির নাটকীয়তার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। কাহিনির গতিশীলতা, চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার গল্পগ্রন্থটির অন্তর্গত গল্পগুলোকে শ্লীল-অশ্লীল বোধ ও তৎসম্পর্কিত প্রশ্নের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। চরিত্র সৃজনের মুন্সিয়ানা, বহুমুখী ঘাত-প্রতিঘাতে মনোবৈচিত্র সৃষ্টিতে প্রতিটি গল্পই শিল্পসার্থক ছোট গল্পের পর্যায়ে উন্নীত। গল্পগুলোতে উঠে আসা সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা পাঠক সত্তায় মিশে যেন অস্তিত্বের অংশ হয়ে ধরা দেয়।

গ্রন্থপঞ্জি

চন্দন আনোয়ার, ২০১৪, পোড়োবাড়ি ও মৃত্যুচিহ্নিত কণ্ঠস্বর, ঢাকা, কথা প্রকাশ

চন্দন আনোয়ার, ২০১৯, অসংখ্য চিৎকার, ঢাকা, যুক্ত প্রকাশনী

শিশিরকুমার দাশ : জ্ঞানচর্চার আলোকে (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

সুকান্ত ঘোষ

একটা অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করবো। সময়টা ২০০৮, সাল ট্রেনে করে দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরছি। ট্রেনে এক ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস করলেন, দিল্লিতে আমি কি করি? তখন আমি এম.এ পড়ছিলাম। আমিও সদুত্তর দিলাম- আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে বাংলায় এম এ করছি। তিনি বলেছিলেন- যে বিভাগে শিশিরকুমার দাশ পড়িয়েছেন তার মান তো অপরিসীম। আমি একটু দ্বিধানিতভাবে উত্তর দিয়েছিলাম- হ্যাঁ। কারণ তখন তাঁর কর্মজগৎ ও জ্ঞানজগতের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। এখনো যে খুব একটা পরিচিতি হয়েছে এমন দাবী করছি না। কিন্তু যে সামান্য পরিচয় পেয়েছি তাতে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি, নয় বছর আগে সেই ভদ্রলোকের কথার তাৎপর্যখানি।

ফরাসি দার্শনিক পাস্কেল (Blaise Pascal : 1623-1662) বলেছিলেন সবারই কিছু রেখে যাবার থাকে। সে হোক না দীন বা দরিদ্র। শিশির কুমার দাশ আমাদের জন্য রেখে গেছেন অফুরন্ত জ্ঞান জগৎ ও সীমাহীন চিন্তার বিকাশ। যা শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় আরও একটু প্রসারিত করে বলা যায় বৈশ্বিক স্তরে উত্তীর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করবো। প্রথমেই স্বীকার করে নেব, কয়েকটি সমস্যার কথা। প্রথমত স্বল্প বিদ্যা নিয়ে শিশিরকুমার চর্চায় অংশগ্রহণ আমার ধৃষ্টতা। আলোচনাটি অধমের সামান্য প্রয়াস মাত্র। আর দ্বিতীয়ত জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার অনেক রকম সমস্যা রয়েছে। জ্ঞান কী? কীভাবে এটি তৈরি হয়? আর কোন আঙ্গিকে এটি বিচার্য ইত্যাদি প্রশ্নের সাথে জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়টি সম্পৃক্ত। এই ধরণের জটিলতায় আমরা যাবো না। শুধু শিশিরকুমার দাশের কয়েকটি লেখা অবলম্বনে বাংলা – ভারতবর্ষ - ইউরোপে তাঁর মনন ও চিন্তনের একটি 'Journey' কে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকাকে আশ্রয় করে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির যে মননচর্চার উন্মেষ ঘটান, তা রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ঐ পত্রিকায় অব্যাহত ধারায় রক্ষিত হয়েছে। তারপর থেকে অনেক নতুন চিন্তাভাবনার উন্মেষ দেখা গেছে নানা বিদগ্ধ মনীষীদের রচনায়। বিশশতকের এক অন্যতম চিন্তাবিদ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন বঙ্গদর্শন (আষাঢ় ১৩১৩) পত্রিকায় 'বর্তমান

ড. সুকান্ত ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মিরাণ্ডা হাউস, দিল্লি

যুগের স্বাধীন চিন্তা' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন- "আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান, আত্মনির্ভরের গভীর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এই স্বাধীন চিন্তা প্রতিষ্ঠিত; জগৎ সংসার কেবল সেই এক, অখণ্ড অচিন্ত্য জ্ঞানেরই বিকাশ, এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া ইহার দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত প্রসার। ইহা যথেচ্ছচারী বা অসংযত বুদ্ধি নয়; সহজ মানব প্রকৃতিতে ইহার মূল থাকিলেও, ইহা কঠোর সাধন, শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ। নির্ভীকতা ইহার প্রকৃতি, বিশ্বরূপদর্শন ইহার আকাঙ্খা; বিভূতিযোগ ইহার সাধনের সামগ্রী। (উদ্ধৃতি : আলোক রায়, বাঙালির মননচর্চার ধারা, ২০১০, ৫৫-৫৬)

বিশ শতকের ষাটের দশকের প্রবাদপ্রতিম চিন্তাবিদ শিশিরকুমার দাশ এই 'স্বাধীনচিন্তা' ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিশীল রচনা, প্রবন্ধ ও অনুবাদের মাধ্যমে। আর এই চিন্তা ও জ্ঞান ক্রমবিকশিত হচ্ছে বাংলাভাষার কোনো রকম একাডেমিক চাহিদা ছাড়াই রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা। বার বার ফিরে গেছেন কবিতার কাছে। তাঁর অনুবাদ চর্চার মধ্যে এরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব', সোফোক্লেস-এর 'রাজা ও ইদিপৌস ও আন্তিগোনে, এউরিপিদেস-এর বন্দিনী এবং প্রাচীন গ্রীক কবিতার অনুবাদ সংকলন 'বহুযুগের ওপার হতে'। এই সব অনুবাদগুলি তিনি করেছেন মূল গ্রীক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায়। প্রসঙ্গত লেখক নিজেই লিখেছেন- " সেই গ্রীস লুপ্ত, তবু মানুষের স্মৃতিলগ্ন; সেই গ্রীকভাষা লুপ্ত, তবু তারই পরিবর্তিত রূপ এখনও প্রবহমান। সমস্তই হারায়নি, মানুষের ইতিহাসে সবই আছে; স্মৃতির সুদূরতম তটে এখনও সুদূরতম অতীত প্রাণময়। তাই সেই গ্রীস সুদূর, কিন্তু অনায়ত্ত নয়; প্রাচীন, কিন্তু এ প্রাচীন নয় চিরমৌন। কালের ব্যবধান, চিন্তার ব্যবধান, নানা সমুদ্র নদী প্রান্তরের ব্যবধান সত্ত্বেও এ প্রাচীনের কণ্ঠস্বর এখনও ভেসে আসছে।" [উদ্ধৃতি : সৌরীন ভট্টাচার্য, অবলুপ্ত মননের মধু?, ১৪১০, ৭৮]

লেখকের বক্তব্য থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায় তা হল, প্রাচীনের প্রতি আকর্ষণ এবং মানব ইতিহাসের প্রতি প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বাঙালী পাঠক ও বুদ্ধিজীবির কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির জ্ঞানসম্পদকে। ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'মধুসূদনের কবিমানস'-এ তিনি দেখালেন ১৯ শতাব্দীর পরিমণ্ডলে চিরকালীন রহস্যময় ও 'দ্বন্দ্বসমাকুল' এক প্রতিভাময় কবি ব্যক্তিত্বকে। এই আলোচনায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ইউরোপীয় নবজাগরণ ও বাংলার নবজাগরণের ফলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতিগত ভাবে এক এবং 'মধুসূদন রেনেসাঁসের প্রথম কবি।' (শিশিরকুমার দাশ, মধুসূদনের কবিমানস, ১৯৮৯, ৬)। এই বক্তব্যকে প্রমাণ করতে তিনি 'কবিমানস' কথাটি ব্যাখা করেছেন যেখানে কবির সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব দুটি মিলিয়ে একজন কবি। "'কবিমানস' যাকে আমরা বলি তা ব্যক্তির সামাজিক সত্তার ওপরেই নির্ভরশীল। তাঁর ব্যক্তিত্বের সেই কটি লক্ষণকে জানতে

হবে যার মধ্যে তাঁর সমগ্র জীবনের আশা-আকাঙ্খা আবর্তিত হয়েছে।" (তদেব, ১১) কবির এই 'আশা-আকাঙ্খা' রেনেসাঁস তাত্ত্বিক উইল ডুরাট এর বক্তব্যগুলি মধুসূদনের সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিলে যায়-

"তীক্ষ্ণমনা, সজাগ, বহুমুখী, প্রতিটিভাব ও Impression- এর প্রতি মন খোলা, সৌন্দর্যে মুগ্ধ, যশোলুব্ধ।" (তদেব, ১৫) এইরূপ দ্বন্দ্বময় শিল্পীমানসের 'আশা-আকাঙ্খা'-র রূপটি নতুন রূপে বাঙালী পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন মধুসূদন একজন বিশ্বনাগরিক ও 'বিশ্বপথিক বাঙালী কবি।

১৯৯২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ভাষা জিজ্ঞাসা' বইটির ভূমিকাতে তিনি লেখেন- " অনেকদিন ধরেই ভেবেছি সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের জন্য ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বাংলায় একটি প্রাথমিক বই রচিত হওয়া উচিত। এরকম প্রাথমিক রচনা লিখতে পারেন কোন যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক। কিন্তু বাংলাদেশে ভাষাতাত্ত্বিকের অভাব না থাকলেও, তাঁদের সময়ের অভাব আছে। (শিশিরকুমার দাশ, ভাষাজিজ্ঞাসা, ৫)

বইটি পড়লে বোঝা যায় এটি কোনো প্রাথমিক ভাষাতত্ত্বের বই নয়। বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে বইটি ভাষাতত্ত্বের একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। আলোচ্য বইটিতে তিনি ভাষার দুটো দিকের কথা বলেছেন- এক নিয়ম শৃঙ্খলা ও প্রকৃতির শৃঙ্খলার। নিয়ম গুলি কী, তাদের ব্যবহার, প্রতীক কী তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়। আর দুই 'শিক্ষা সাপেক্ষ', 'সংবাদ-বিনিময়ের মাধ্যাম' এ প্রসঙ্গে ভাষার সামাজিক ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ফের্দিনান্দ দ্য সোস্যুর এর 'External Linguistic', 'Internal Linguistic' আবার স্যাপির ও হোর্ফ-এর 'স্যাপির- হোর্ফ তত্ত্ব' এমনকি প্লেটোর ভাষা চিন্তা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ভাবনা গুলি সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'তারায় তারায়' গ্রন্থটিতে মিশরে, চীনে, ভারতবর্ষে, ইউরোপ, আমেরিকায় যে নক্ষত্র কাহিনি গড়ে উঠেছে- 'ভয়ে,বিস্ময়ে, আর অনুরাগে', সে গুলিকে বাংলা ভাষায় রূপ দিলেন শিশিরকুমার দাশ।

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় শিশিরকুমার দাশের 'লুকাচের ক্রোধ' প্রবন্ধটি এবং তিনি লিখেছেন- "এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশের কোনো রবীন্দ্রআলোচক এখনও লক্ষ্য করেছেন বলে মনে হয় না।" (শিশিরকুমার দাশ, লুকাচের ক্রোধ, ১৪১০)। প্রজ্ঞান সমালোচক লুকাচের একটি প্রবন্ধটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' –র সমালোচনা। সেই প্রবন্ধটির প্রতিপক্ষে প্রাবন্ধিক শিশিরকুমার দাশ লুকাচের সমালোচনা করে বৌদ্ধিক জগতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন লুকাচের কোথায় কোথায় ভুল ছিল।

তিনি আলোচনা করেছেন লুকাচের মতো ধীমান সমালোচক শুধু নিজের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন, কোনো যুক্তি বা তথ্য সংগ্রহ করে জানার চেষ্টাও করেন নি। তাঁর(লুকাচ) খারাপ লেগেছিল জার্মান বুদ্ধিজীবী লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বড় মাতামাতি করেছে এই ব্যাপারটি। তাই তিনি বলেছেন-" এটিই জার্মানীর সংস্কৃতিক জীবনের একটা কলঙ্ক, বুদ্ধিজীবীদের শূন্যগর্ভতা।" (তদেব,২৯) শিশিরবাবু যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে লুকাচের সিদ্ধান্ত ভুল, এমনকি তাঁর পড়া রবীন্দ্র অনুবাদ প্রসঙ্গেও সন্দেহ পোষণ করেছেন।

শিশিরকুমার দাশ তাঁর 'মধুসূদনের কবিমানস' গ্রন্থে লিখেছেন- " আধুনিক কালে আমাদের মনে একটি বিশেষ সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা আজ যদি কেউ নিজেকে বাঙালি ভাবি তাহলে তাকে প্রাদেশিক আখ্যা দিই।" (প্রগুক্ত, ৯৯) ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই কবি লেখকদের মধ্যে বাংলাকে বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল, মধুসূদন, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র সকলের দৃষ্টি হয়েছিল ভারতমুখী। বাংলা ছাড়িয়ে দৃষ্টি পড়েছিল রাজস্থান, উড়িষ্যা, কনৌজ ইত্যাদি স্থানে। শিশিরকুমারও প্রাদেশিকতা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। তাঁর পড়াশোনা কলকাতা ও লন্ডনে। কর্মসূত্রে বেশি সময় কাটিয়েছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময় তিনি রচনা করেন- 'A History of Indian Literature' Vol: i, 1800-1910 Western Impact: Indian Response (1991) Vol: ii, 1911-1956 The Struggle for Freedom: Triumph and Tragedy 1995 গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছেন- "ভারতীয় সাহিত্য যে বহু সাহিত্যের সমাহার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে যে গভীর মিল আছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ঐক্য এবং বিভিন্নতা, কতগুলি মিলিত পরম্পরা, সমবেত অভিজ্ঞতা ভিন্ন সাহিত্যের অভিঘাতের প্রকৃতি ইত্যাদির কথা ভেবেছিলাম। দেখাতে চেয়েছিলাম আমাদের সাহিত্যের নানা উপাদান, তাদের মিল ও অমিল।... একটা বহুভাষী দেশের সাহিত্যের চেহারা কেমন হতে পারে সেটা দেখাতে চেয়েছিলাম শুধু ভাষার নিরিখে, সাহিত্যকে চিহ্নিত না করে। চিন্তা, আদর্শ, ভাবের নিরিখেও সাহিত্যকে চেনা যায় কিনা এই প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিলাম।" [প্রাগুক্ত, ১৩১]

বোঝা যায় কী পরিমাণ পরিশ্রম, অধ্যাবসায় ও একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চার ফসল এই দুইটি খণ্ড যা সমগ্র ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সামনে আলোচনা ও বিতর্কের নব নব ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। আমার শিক্ষিকা নন্দিতা বসুর 'ভারতীয় সাহিত্য বিদ্যা ও শিশিরকুমার দাশ' প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্যের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে বহু ভাষার সমস্যার বিষয়ে তিনিই প্রথম বুদ্ধিজীবী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করান। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক শিশিরকুমার দাশের এক অভিভাষণ তুলে ধরেন- "ভারতবর্ষের বহুভাষিক

সমাজের বাস্তবতা এই ভাবেই কালিদাসের লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু কালিদাসের কালে নয়। মধ্যযুগের 'ব্রজবুলি' সংস্কৃতের সঙ্গে তামিল বা মালায়লম মিশিয়ে মণি প্রবাল রীতি ভারতচন্দ্রের যাবনী মিশাল ভাষা, বন্দেমাতরম গানের মিশ্রভাষা সবকিছুই ভারতবর্ষের বহুভাষিক সমাজের প্রয়োজন থেকে উদ্ভুত। (প্রাগুক্ত, ৯৮)

কোনো সংকীর্ণ বাঙালি মানসিকতা থেকে এই ধরনের ভারতবর্ষীয় চিন্তা ভাবনা সম্ভব নয়। তাই তিনি শুধু বাঙালি নন, ভারতীয়। বাঙালি কবির বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সংগীত যেমন সারা ভারতবর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল; তেমনই শিশিরকুমার দাশেরও জ্ঞানদীপ্তি ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক সমাজকে আলোকিত করেছে।

'মধুসূদনের কবিমানস' গ্রন্থে লেখক এলিয়টের ঐতিহ্য বিষয়ক একটি ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন-" ঐতিহ্য শব্দটি গভীর অর্থদ্যোতক। ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু পাওয়া যায় না, তাকে অর্জন করে নিতে হয় প্রবল পরিশ্রমে। প্রথমতঃ প্রয়োজন ঐতিহাসিকবোধ- ঐতিহাসিক বোধ বলতে বোঝায় একটি ধারণা। অতীতের অতীত্বকে শুধু অনুভব করাতেই তার শেষ নয়। অনুভব করতে হয় তার উপস্থিতি। এই ঐতিহাসিকবোধ জাতীয় ঐতিহ্যের নিবিড় পরিচয় গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয় না- তাঁকে বৃহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেবার প্রেরণা পায়। [প্রাগুক্ত, ৯৬]

এই জাতীয় ঐতিহ্যকে লেখক যুক্ত করে দিলেন বৃহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে ১৯৭১ সালে তাঁর 'Western Sailors Eastern Seas' বইটির মধ্য দিয়ে এবং তিনি সম্মানিতও হন ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির নেহেরু পুরষ্কারে। বইটির বিষয় হল জার্মানি ও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অর্থাৎ ইতিহাসের লক্ষনীয় দিকগুলি যা এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। "Cultural relationship is a relationship of minds. It grows through mutual admiration and love but not by love alone." (Das, Western Sailors Eastern Seas, 1971, xii)

পাশ্চাত্য নাবিকের কাছে ভারতবর্ষের আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। একদল নাবিক এল ব্যবসা বাণিজ্য করতে মূলত ভারতবর্ষের সম্পদ লুট করতে। অপর একদল এল মিশনারীরা প্রধানত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। অন্য আরেক দল যারা মূলত স্কলার, তারা ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছেন, প্রাচীন ঐতিহ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন, ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের কাছে সেই জ্ঞান সম্পদকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। The Philosophy of History গ্রন্থে হেগেল লিখেছেন- "to the treasures of this land of marvels, the most costly which the earth presents; treasures of Nature... as

also treasure of wisdom." (op.sit,1)

ব্রিটিশ স্কলার, মূলত জার্মান স্কলার তারা এসেছিলেন ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জানতে। প্রথম জার্মান স্কলার ফ্রিডরিচ শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯) আলেকজান্দার হ্যামিন্টনের কাছ থেকে প্যারিসে গিয়ে সংস্কৃত শেখেন এবং ১৮০৮ সালে লেখেন—'The Language and wisdom of India' ভাষার দিক দিয়ে একটি সুবিধা ছিল - সংস্কৃত; গ্রীক ল্যাটিন ও টিউটনিক ভাষাগুলি একই ভাষাবংশ থেকে উদ্ভূত। শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন- " Schlegel's love for Sanskrit Literature is an outcome of his love for the exotic elements in Literature as well as of his strong insistence on the identity of poetry and morals." [ibid, 3]

বোঝা যায় জার্মানদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া অনেকাংশে আবেগীয় রূপ ধারণ করেছিল। জর্জ ফস্টার 'শকুন্তলা' নাটকটির জার্মানী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বন্ধু জোহান হার্ডারকে একটি কপি পাঠিয়ে দেন। হার্ডার উচ্চ প্রশংসা করে বন্ধুকে লেখেন-"I can not easily find a product of the human mind more pleasant that this one...a real blossom of orient, and the first most beautiful of its kind..." (ibid, 4)। হার্ডারের কাব্যখানি এতটাই ভালো লেগেছিল তিনি এটি গ্যেটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গ্যেটে শকুন্তলা পড়ে একটি কবিতা লিখে ফেলেন। এটি ছিল মহান এক ইউরোপীয় কবির কালিদাসের প্রতি প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য। যে রোমান্টিক ভাব শ্লেগেল ও হার্ডারের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, পরবর্তী কালে তা অনেক স্কলারদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। যেমন- "Heine's (1797-1856) well-known poem "Auf Fluegeln des Gesanges' is the finest expression of the Romantic attitude towards India" (Ibid,6)

শুধু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য নয় ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও অনেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কার করলেন। প্রথম ১৮১৬ খ্রীঃ ফ্রাৎজ বপ এই কাজটি করলেন। তাঁর পরবর্তী জার্মান জেকোব গ্রীম ১৮২২ সালে আবিষ্কার করলেন সংস্কৃত গ্রীক ও জার্মানি ভাষার মধ্যে সম্পর্ক সূত্রটি। যা গ্রীমস্ ল (Grimm's Law) নামে পরিচিত।

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে জার্মান স্কলাররা ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। প্রত্যেকেই ভারতীয় দর্শনকে জীবনবিমুখ ও আত্মত্যাগের দর্শন বলে মনে করেছেন। সোপেনহাওয়ার উপনিষদ পড়ে অনুভব করছেন সেখানে আছে হতাশা, ব্যাধি, অতৃপ্তিময় একটি ট্র্যাজিক জীবন এবং দীর্ঘ ভোগান্তির পর মৃত্যুতেই তার পরিসমাপ্তি। হেগেল, নিৎসে, কান্ট প্রত্যেকেই ভারতীয় দর্শনের কম বেশী সমালোচনা করেছেন। ম্যাক্স মুলার প্রথম ভারতীয় দর্শনকে

বুঝলেন এবং আত্মস্থ করলেন। ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কটি ফুটিয়ে তুললেন। ইতিপূর্বে প্রত্যেকেই ভারতীয় দর্শনকে ধর্মের আদলে দেখছিলেন। ম্যক্স মুলার ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন, শ্রদ্ধা করেছিলেন। বৈদিক - ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ও পালি ভাষায় ছিল তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানতেন হিন্দুশাস্ত্র। তাই শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন- "In this interchange of thought Max Mueller played an important part. Modern India has made the heritage of Europe a part of her own heritage." [ibid,28]

পরবর্তীতে ম্যাক্স ওয়েবরকে দেখা যায় সাংস্কৃতিক সম্পর্কের একজন গুরুত্বপূর্ণ সমালোচকের ভূমিকায়। তিনি ভারততত্ত্ববিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমাজতাত্ত্বিক। তিনি হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল আগ্রহের জায়গা ছিল ধর্ম ও সমাজের অন্তর সম্পর্ক নির্ণয় করা। তিনি তাঁর এই অবস্থানের জন্য প্রাচ্য পণ্ডিতদের কাছে নানাভাবে সমালোচিত হয়েছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের আদানপ্রদানের ইতিহাস শিশিরকুমার দাশ বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। অনেক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর কাছে খুলে দিয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্তর সম্পর্কের মনন সূত্রগুলি। জ্ঞানের জগতে তিনি ' enlargement of taste' –এ বিশ্বাস করতেন এবং একই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতেন- 'যতই জানি অন্যকে ততই জানি নিজেকে। (প্রাগুক্ত, ১৪০) এই অন্যকে জানার উদ্মাদনা বৌদ্ধিক জগতে তাঁকে বাঙালি থেকে ভারতীয় হয়ে বৈশ্বিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

তথ্যপঞ্জি :

১। Sisirkumar Das, 1971, Western Sailors Eastern Sea, New Delhi: Munshiram Manoharlal.

২। শিশিরকুমার দাশ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, ভাষাজিজ্ঞাসা, প্যাপিরাস, কলকাতা

৩। শিশিরকুমার দাশ, ২০১২, তারায় তারায়, কারিগর, কলকাতা

৪। শিশিরকুমার দাশ, ১৯৮৯, মধুসূদনের কবিমানস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৫। সুবল সামন্ত (সম্পা), শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা শারদীয় ১৪১০, এবং মুশায়েরা, কলিকাতা

৬। আলোক রায়, ২০১০, বাঙালির মননচর্চার ধারা, বিশ্বদীপ ঘোষ(প্রকাশক), নিবন্ধ বৈচিত্রের তিন দশক, অক্ষর বিন্যাস, কলকাতা

Three Genres in the writing of Tripura

Bhaskar Roy Barman

By 'three genres' I mean, drama, poetry and short story. When it comes to dealing with literature of Tripura, we cannot think of one separated from the other two; it is difficult to write a full-fledged article on one of the genres. Literature of Tripura, so to say, nourishes itself on writing of poetry very rich in itself and there are no mean number of plays performed on stage. A few writers have attempted short stories and on the finger are counted writers who have written novels. In fact short story writers have turned to writing novels and they have achieved no separate identity as novelists. So I have left novels out of the discussion and chosen just three representative short stories and one representative poem, considering the constraint on word-length. The poem and the short stories chosen tend to sarcasm.

As we all know; the visits of Rabindranath Tagore to Tripura inaugurated a spurt of writing poetry in Bengali and Kokborok and brought the literature, mostly poetry, from inside the palace. Under his dramatic influence. plays started being written and performed on stage.

Tagore's visits to Tripura produced two-fold offshoots of influence on the literature, art and culture of Tripura, one of the writing of plays around the culture of Tripura and the other of the composition of the poems. The plays are: Bhagna Hriday (The Broken Heart), a verse play, Mukut (The Crown) both a short story and a play, Bisarjan (The Sacrifice), another verse play which have profusely enriched and deregionalized the literature and culture of Tripura.

I shall pick on to discuss the first play 'Bhagna Hriday' (Broken heart).

Kavi (Poet), protagonist in the verse play, has grown up with Murala, the heroine, through plucking of flowers and singing songs addressed to no one else around. In tune with his growing up Murala's mind is getting restless and she feels an incessant ocean of restlessness surge deep in her heart. To calm down her mental restlessness she loves listening to the murmuring of the silence and stillness of the garden. One day Murala, pointing her finger at Kavi they see coming towards them confides to her friend her deep love for him, when asked who she loves,

Dr. Bhaskar Roy Barman, Renowned writer, Agartala

as they are deep in conversation on the trysting of Lalita with Anil on the banks of Bipasha. On stepping into the scene, Kavi gets captivated by the manifestation of the stillness of the garden on the person of Murala, as if she is standing before him as the goddess of woods. He expresses his wish to have Chapala bedeck her with flowers and leaves. He does not know Murala has given herself over in love to him. It is Chapala who whispers to him Murala's profession of

love

:

Tell me, Kavi, tell me, my poet,
what has happened to you two?
Tell me my poet, tell me in confidence
, what mantra you have articulated on my friend.
She has stopped playing
and keeps meandering the garden around,
drinking in the silence and stillness.
I have kept her company for many a day,
but know not what is ailing her.
Your have grown up together
and have sauntered out and around,
holding one another's hand
I know not what mantra
you have whispered into Mural's ears
and what sorcery you have infused into her heart.(March 1985:810-11)

(The translation mine)

On getting to know of the mental flower blooming in her heart from Chapala he abandons himself to the splurge of thinking that his human life will be suffused with a completely new meaning.

On the bank of the Bipasa Kavi meets up with Nandini surrounded by his friends and to Kavi she looks the queen of the companions. Her beauty and the restlessness that rhythms in her movement captivate Kavi. The way she is looking at him creates a stir and thrill in his heart "Is it called love?" Kavi finds himself wondering. He confides to Murala his enchantment by Nandini. Murala reacts to it as a profession of his love to Nandini, ensconced in the loneliness of her being

Why does the wretched , bereft of beauty and quality,

dare nurture love in her heart?
She lives just a few days under no eye,
loves only to suffer and dies unknown.
A tiny grass-flower gets born in the dark,
lives just for a while and dries down
in the midst of its own thorns
and in the midst of his thorn is its burial (March 1985:854)

(The translation mine)

Murala harbours unarticulated love in the heart of her hearts for Kavi, but she is quite aware that she is not as beautiful as Nandini, as frivolous as she. Nandini's beauty and frivolity sway Kavi's mind away from her. So she has resorted to soliloquizing to console and control her mind feverish with love for Kavi

One day Kavi is overflowing with emotion and ecstasy at Nandini's pleasure-garden, as he hears Nandini is singing his song. He comes over to Murala and sings, his song addressed to Nandini: 'Who are you to have opened the door to heaven?....I place my love-present at your feet.' One day Kavi is sitting, as usual, on the wayside. Surrounded by her companions, Nandini comes over, but when she does not see Kavi anywhere around, she goes back. Disappointed, Kavi keeps sitting the whole day. Towards the evening he goes round to Murala. His heart breaks, when he sees Murala weeping plaintively. Chapala speaks out against his indifference to Muraal and reminds him of Murala's love for her.

One day in the evening Kavi comes, as usual, down to the door of Murala's house and sees near the door his lamplit seat and tuberose garland by it, but there is no Murala anywhere around. Previously every evening she would come down and the lamplit seat would welcome him from afar when he was on the way to Murala's house Overwhelmed with grief, Kavi burst into crying for Mural. Chapala comes out and blames it on him, saying that it is because of him that Murala has left this house. Gripped by an intense remorse, Kavi is roaming, the tuberose garland in hand, through the village aimlessly, searching for Murala. He bumps into Anil on the way who takes him over to where Murala is lying on a deathbed. He marries her 'then and there', putting the tuberose' garland' round her neck. Kavi says that their marriage was solemnized in this way. They will arrange for their nuptial bed to be adorned with never-withering flowers in the place where flowers never wither.

Though Tagore wrote it as a play, he poured all his poetic emotion on to it. The play is very difficult to perform and understand until his

concept is located in it. The play carries a concept, a message which is not restricted to a particular time or a particular place. It has a universal appeal which has transcended the time and the place. Love is sanctified on the altar of the Muses. Love represented in the person of Murala is not the love of the body, it is the poetry of the soul, the flower that never withers. Chapala and Anil are introduced into the play as type characters to catalyse the blooming of the never-withering flower. The love between Anil and Lalita that Chapala has dragged into her conversation with Murala just serves to unveil the love that is surging like a sea in the heart of Murala's hearts and this knowledge helps Chapala in uniting Kavi's love with Murala's. Nandini's frivolity acts as a foil to the steadfastness of Murala's love for Kavi who represents all the poets of the world who are apt to be swayed away by manifestations of sight and sound around them. Besides, Kavi's averment that they will arrange for their nuptial bed to be adorned with never-withering flowers in the place where flowers never wither suggestsTagore's philosophy on the immortality of the soul and that of love.

The conflict between two separate and distinct cultures that confronted each other monopolized the poetry and the stories written in the fifties and particularly in the poetry of the fifties are discernible the influences of Rabindranath Tagore and Jibananda Das. Besides, the effect of partitioning of India dominated the poetry of that period, but petered out in the poetry written in the sixties. Many poets and short story writers felt themselves settled after a decade had elapsed since the mss-exodus and indulged in, or tried to indulge in, satire or sarcasm and their sarcasm effected in their poetry or short stories. But no novel worth mentioning was written in the fifties or sixties. In order to stand on their own feet, many writers in the sixties shook themselves free of the influences of Rabindranath Tagore and Jibananda Das and created a commonwealth of writing through the establishment of a literary group called 'Sahitya Basar'. Many poets and writers assembled under the umbrella of Saitya Basar. Salil Krishna Deb Barma stood out distinct and prominent among the poets who had got associated with Sahitya Basar and died a premature death. Though his poetry smelt of the water, land and sky of Tripura,. it was infused with a satiric flavour. His first poetry collection, 'Jaler Bhetar,Buker Bhetar'(Inside the Water, inside the Heart) established him as an important poet worth mentioning and emulating. This was only one poetry collection he had published before his death, but all the poems he had written since the fifties spread over different literary journals which helped him on with continuity of writing, Though Salil Krishna wrote original poetry, the influence of Jiabananda is distinctly visible in it and so his poetry is not spiced with satirical or humorous flavour. He tried to

point in some of his poems at some social follies, but it sounds shallow. You can't write a satire or a humorous piece if you have not developed a personal and independent attitude to life by yourself experiencing the problems surrounding you and peculiar to the land you are living in and by interpreting the experience in your own way. Before he could shake himself free of the influence of Jibananda Das he died.

Another poet who deserves to be mentionedis Bijan Krisghna Chaudhury who took to writing poetry after the Independence. A few poems written during the first phase of his writing career were imbued with a flavour of the influence of Jibananda Das. Fortunately in course of time when his poetry matured, he successfully unshackled himself from this extraneous influence and started producing poems impregnated with his own feelings vis-à-vis the problems surrounding him and established himself as a distinct poet. His later poems displayed a truthful portraiture of man and nature and the inherent characteristics of the culture and atmosphere of Tripura, and carry a toothsome flavour of sarcasm,

It is worth quoting in this connexion a few lines of – I have translated them – of a poem of his, entitled 'Atayeb', pungent with sarcasm. The reader might notice a tinge of humour in it. The original poem is quoted in two or more articles dealing with the poetry of Tripura..

I don't enter the examination hall,
for before my eyes the examinees open books
to become learned.
I don't go to the cinema
lest I should buy tickets
at the expense of my conscience.
I don't board a city bus,
for both urchins and conductor
delightedly violate strictures
upon smoking.

The poet wrote the poem from the angle of his profession –the poet was a well-known professor teaching Bengali. In this poem he satirizes the go of the present-day life obtaining in Tripura, as in other parts of India. He projects himself as a prototype of all the professors and the teachers entrusted to teach students at colleges and schools. He does not dare enter the examination hall lest he should be humiliated by the examinees who take to copying from books in order to 'become learned'. He satirizes the way the would-be scholars – they are aiming at becoming professors – aim to become learned. The poet does not let slip the opportunity to castigate

the aura of separateness professors (and teachers also) tend to create around themselves, for 'professing' (and reaching) is a noble profession, as in the fourth, fifth and sixth lines. Quite aware of the nobleness of his profession, he is entitled to see films free. No one gives him free tickets. So he does not go to cinema, because he is required to 'buy tickets/ at the expense of conscience'. The last four lines tell us that the poet does not board a city bus, because both "urchins' and 'conductor' violate the strictures upon smoking. The poet is, I think, aware that nobody gives a hang for his profession and his profession is confined within the four walls of his college. Sarcasm is implied in the portrayal in vivid relief of the pseudo-prestige that practitioners of teaching desperately adhere to.

In fact short stories in the true sense started being written after Independence. It was Bimal Chaudhury who pioneered the short story writing in Tripura by writing his fist short story, ;Jagaran' (Awakening) in 1947 just on the heels of the achievement of Independence. Under the influence of this short story awakened the trend of short story writing. The story tells of how Nagurai, the protagonist in the story is awakened to the need of asserting himself and others humiliated and oppressed and how their superstition and ignorance have killed his parents. His second story, Hijla Khaler Kanna (the Cry of Hijla Canal), Bimal Chaudhury gives expression to the agonies of the Bengali refugees who migrated to Tripura, uprooted from their homeland, East Pakistan (now Bangladesh) in the person of an eight-year or nine-year old boy. In this connexion it should be mentioned that Bimal Chauduiry had begun writing poetry before turning to writing short stories. Though the short stories I happen to have read smack of a tiny bit of sarcasm, I have mentioned him and his two short stories, because he pioneered short story writing in Tripura. In fact almost all the short story writers wrote short stories, centring on the effect of the refugee problems, and later in the eighties, on the effect of the communal riot that occurred in the first part of the eighties, which has shattered the stability of life. Even today the people, particularly the Bengali inhabitants, feel their life instable.

A story by Subimal Roy, a short story writer contemporary with Bimal Chaudhury, has struck me as a satirical short story. I have read a few other short stories of his. They are not as pungent as the short story, entitled Yatri (passenger), they are just representations of what their author has experienced. Yatri is the title of the short story collection published in 2003 and is a social satire. It, though a representation of his personal experience, reveals a sarcasm on the mental set-up of all the passengers habituated to travelling like sardines on buses or jeeps. The story satirizes adjustment of passengers to their wonted feeling of inconveniences, winnowed of the courage to protest and they even cool-

stare into silence whoever dares protest. In the story we come across a variety of passengers travelling on a jeep. The jeep is packed full of passengers. Many passengers are standing on the iron deck attached to the jeep. A well-dressed and bearded youth in his early thirties is standing near the jeep, looking for a vacant seat in the jeep to sit on. He is known to the driver chewing at a paan. A personal interest of the driver lies with the well-dressed youth who has some influence with the government. Jeep-drivers have demanded the government increase in jeep fare, as their conversation between them later reveals. He believes, like other jeep drivers, if he exercises his influence, the government will approve the increase in jeep fare. A rustic- and innocent-looking youth is sitting on a front seat. He forces him into vacating the front seat so that the well-dressed youth can sit on it. No other passengers protest at such humiliating behaviour; rather they insist on the rustic- and innocent-looking youth vacating the seat for the well-dressed youth. The rustic-and innocent-looking youth has no alternative but to vacate his front seat and go to the back of the jeep. The helper somehow manoeuvres him onto the iron desk.

A policeman stops the bus on the way for carrying passengers beyond its capacity. He examines all the papers of the driver. He then asks every passenger whether he or she will be a witness at the court. The well-dressed youth sitting beside the driver says he has come from Kolkata; an old passenger says he does not see well; a woman, a school teacher, implores the policeman not to put her to the trouble of going to the court; a smart boy, sitting at the backside, gives the policemen false information about himself and his address. But the rustic- and innocent-looking youth gives the police his exact name and address, for he has not leant the art of telling lies.

For the crime of giving the police his exact name and address, the driver forces him off the jeep before the very eyes of the passengers and drives the jeep away with other passengers packed in like sardines, leaving the youth helpless on the road. He has silently endured the humiliation, without protest.

References:

March 1985: Rabindra Rachanavali (Vol. VI); Government of West Bengal

2006: Roy Barman, Bhaskar: El Dorado: An Anthology on World Literature' Delhi:

Reflection of Indigenous Society and Culture in Kokborok Proverb

Swapan Sharma

Tripura is a small hilly state in the north-east of India. In Tripura, the Tribal and Bengali people live together. The number of official languages of Tripura is two – Bengali and Kokborok. Kokborok language has been used as an official language in Tripura since 1979. Kokborok is a main tribal language of the Tripuri people. Apart from Tripura, kokborok language is prevalent in some parts of Bangladesh and Assam in north-east India. There are nineteen different tribal communities in Tripura. Each of the tribal communities has their own culture, which we call Indigenous culture. Among them, people of eight major tribal communities speak kokborok language. These tribal communities are Tripuri (Debbarma), Reang, Jamatia, Noatia, Murasing, Koloi, Rupini and Uchoi. Their culture and lifestyle are more or less similar. Tripuri is the largest tribal community in Tripura. Therefore, kokborok is considered as the major tribal language of Tripura. According to 2011 census report the number of kokborok speaking people are 8, 80,537 which is 23.97% of total population in the state of Tripura.

Neighboring Bangladesh country is located on three sides of Tripura. Since the independence of India in the year 1947, many people have come to Tripura from Bangladesh. As a result, the prevailing proverbs in Tripura have been greatly influenced by Bengali folk culture. Kokborok proverbs also not free from this influence. In Tripura, Indigenous people and people of Bengali communities are dependent on each other in most cases. The daily life of both group's people are spent through mutual assistance. Naturally, there are many similarities between kokborok proverbs and Bengali proverbs.

In everyday and practical life, proverb has been used among tribal people for a long time in kokborok language like other languages of the state. These are used as advised by the elders of the house. In running words proverb is called "Sokang sajakma kok" or ''Sajakma kok''

Dr. Swapan Sharma,
Assistant Professor, Dept. of Bengali,
Govt. Degree College, Kamalpur, Dhalai, Tripura

in kokborok language. Its Bengali terminology is 'Chalu katha'. We know that, many valuable experiences of society are expressed through proverbs. In this article, we discuss indigenous folk life described in kokborok proverbs. Picture of Indigenous Society and Culture are reflected in many Kokborok proverbs. Example – The proverb used to refer to the importance of women in the family- ''Chwla randani nok lingla''. It means men cannot manage home properly without women.

Most of the Indigenous people believe that, there is no alternative to mother. There are many proverbs about mother in the language of kokborok. Example –

1. ''Maani abuktwi node musukni abuktwi pai''. It means, cow milk is not equal to mother milk.

2. ''Toyphano hindi, piphan hindi ama kahayole awngya''. It means, aunty 'masi' or 'pisi' is not equal to mother.

Actual meaning of both proverbs mentioned above is 'Nobody is like your mother'.

Some proverbs have criticized human characters. These proverbs have shown a beautiful picture of the life of Tripuri people. Maximum numbers of Indigenous people live in the hills. They cultivate 'jhum' in the hilly area. They nurture various types of animals, birds in their house which is one of the most important parts of their livelihoods. As a result, various 'jhum's contents, different types of animals like goat, cow, buffalo, hen, pig, many kinds of insects are mentioned in various kokborok proverbs. Some proverbs have been mentioned below.

1. "Damra mai tang chekhra mung lai". 'Damra' has cleared the garbage but name has gone to scissors. It means, one has done the job and another one has collected the name.

2. "Tokma kokoro bikhwaikhe birsana rwngya". Meaning of this proverb is charming minds are full of fun.

3. "Kripanni rang uri chao". Meaning, the miser's wealth is eaten by insect 'wipoka'.

4. "Piya bwtwio nwngnakhe piya chwk jakna nangnai". If you want to eat honey, you are bitten by bees. Meaning, you have to work hard to get something good.

5. "Tok bolongle tok borok khaya". The forest cock never controlled. It means, outsiders are never your own.

A large part of Indigenous people lives in a deep forest. Many times, they have to fight with the tiger to survive. There are several proverbs about the tiger, which are commonly used in kokborok language.

1. “Mwsa bukhugo ta dagardi”. Don’t through anyone in front of the tiger. Meaning, there is no need to ruin anyone.

2. “Tai barwibo mwsani bumul kakya”. Even if the water is crossed, the tiger’s color does not disappear. It means, if the person dies, the behavior of the person concern does not change.

3. “Ang, nono mwsa hang”. Meaning, one who always highlights himself he becomes the victim of the tiger fast.

Indigenous people are diligent. They believe in hard work. They don’t accept anything without labor. A proverb in this regard is “Raang nangyai manma haichukma chao”. Haichukma the deity swallow that object which is easily obtainable. Meaning, which thing is obtained by evil way that goes astray.

A proverb criticizes a lazy person in the following manner.

“Thalik bolongle bwchlwi mamang didale kokbao mamang.” It means the elder brother talks too much and talks nonsense.

Alcohol or ‘desi’ wine is one of the most important parts of festival in Indigenous society. But collecting rice or ‘khud’ is a big challenge for them. They don’t like that kind of people who want to drink alcohol but can’t arrange rice. That picture is shown in the following mentioned proverb.

“Chana mai kwarwi chuyak rutugu”. There is no rice in the house but search alcohol.

Some health related proverbs are available in kokborok proverbs. If there is a disease they prefer ‘Oja’ than the doctor.

1. “Thwainakhe ochyani saam tangwian thwiythun”. At the time of death, I will go to ‘Oja’.

2. “Ochaiyni nogo bemer kakya”. There is always a fever in the ‘Oja’s house.

Social exploitation linked proverb also shown in kokborok language. “Raja borok Tanya, badisi tanu”. People die by the order of courtier not by the order of the king. It means, Courtier Order is more superior to king’s order.

There are a few superstitions in Indigenous society and some kokborok proverbs are regarding these.

1. “Bworwirogni bokhorogo takhum masinini kobor tongu”. The women have seven crazy ducks on their heads. This means, it is not understood that when and what women do.

Women education was not well accepted in Indigenous society. A proverb in this regard

2 “Bwrwi kok kwrwng kaami swbayu”. If women are educated, they spoiled the area.

One of the most important features of proverb is public education. There are many public education related proverbs in kokborok language.

1. “Buni sa kaham nugwi mokol ta thaidi”. Don’t look at the good child of others. Meaning, don’t greed to the things of others.

2. “Thenta ha kwrwi, sele mai kwrwi, kokoini banta koroi”. There is no place of lazy, irritable and assuming person.

Some kokborok proverbs published in different life experiences.

1. “Thamchi kaphuru mokol nugya”. Eyes are blind during the time of anger.

2. “Noktangbawi hik tubdi”. First make the house and then get married.

3. “Samung nangphru nokbeserni riswrwyano mangthokya”. Abandoned clothing is very important in times of crisis. It means, the importance of very little thing is much greater.

4. “Kuchiyano, chakapbay romdi”. The ‘Kuchiyan’ fish have to catch with the straw. It means, we need to keep an eye on the devil all the time.

There is an attempt to make the society aware through these above proverbs.

Picture of creation and life mentioned in kokborok proverbs are very wide and number of proverbs also more. A little number of kokborok proverbs is mentioned in this article as example. There are many innumerable contemporary picture of Indigenous society in the kokborok proverbs. Kokborok proverbs introduce an advanced culture in the Indigenous society. The proverbs are created from real experience and the level of feelings. These proverbs are philosophical characteristics. We need to remember that, the state of Tripura is very rich in its culture and tradition. Each tribe of the state has its own cultural activities. The traditional elements of the small tribal groups of Tripura are full of different cultures. But, mutual relations are the main conditions of this diversity. A universal appeal is also expressed in kokborok proverb. The Indigenous people’s psychology, customs or rituals are hidden in kokborok proverbs. These are important not only in the Indigenous society; it is very valuable for all societies. It is essential, to take the necessary initiatives to continue these valuable proverbs in new generation of Tribal people. But it is sad to say that, in the name of modernization, a large part of Indigenous people forget their own culture today. Especially younger generation of Indigenous society has been adopting the western culture and life style, instead of promoting their own culture. In reality, folk culture or folk literature is very important to everyone for their own identity. Kokborok

proverbs are one of the most important folk literatures of Indigenous society in the state of Tripura. In the era of present globalization, it is very significant to appreciate and preserve of these proverbs.

Referance:

1. Barun Kr. Chakraborty, Bangla Lokasahitya Charchar Itihas, Kolkata, 1999.

2. Barun Kr. Chakraborty, (Editor) Prabad Prasanga, Kolkata, 2010

3. Rabindrakishore Debbarma, Kokrok Prabad Bakkye Tripra Lokajiban, Agartala, Tripura, 2002

Acknowledgement:

1. Jakop Halam, Assistant Professor, Govt. Degree College, Kamalpur, Dhalai, Tripura

2. Sri Ratan Debbarma, Assistant Professor, Govt. Degree College, Kamalpur, Dhalai, Tripura.

Simulkandi in Retorspect: Barman Roys and Roy Barmans at a Glance, Written by Biresh Barman Roy, Published by Notion Press Media Pvt. Ltd, Chennai: ISBN:(paperback): 978-1-63957-422-3; price Rs 249`

Reviewed by: Bhaskar Roy Barman

I am reviewing this paperback edition of a socialistically important book ever published in India.. In writing a two-page foreword to the book, Bhaskar Roy Barman, that is me, confesses that 'To write a foreword to such a book of such unprecedented nature is so pleasant a task assigned to me that it has sent me awhirl in an expression of pleasure and surprise.' Roy Barman also says the book is great 'when considered from a socialistic perspective.,' 'Every society is,' he continues, 'constituted of families, every family has its lineage that it has come down and every lineage has emerged from the common root. .,To forget one's lineage is to forget the root, because the lineage takes us back to the root, the banyan tree." (P.11). The book has an autobiographical tinge, since the author himself says in his Preface that the book is a compilation of factual stories' he has 'inherited from my father and mother' (P.13) and of which he has personal experiences.

The introduction by the author has the readers peep deep into 'the history of the family (a lineage with a missing link) from the time of Raja Man Singh' by his father Paresh Lal Barman Roy, 'son and legal heir of Naba Kumar Barman Roy, the undeclared king/Nawab of Simul Kandi, having an additional belt of six villages around Simul Kandi.' (P.17) In this introduction the author tells the readers that his son Shubhrangshu egged him on to write a history of his family and this explains the writing and publication of this book. The introduction is followed by his expression of gratitude. The chapter begins with his gratitude to his mother Hiranmayee Devi for her having imbibed him with interest in the history of our Barman Sampraday' and that of his grandfather Naba Kumar.. Other persons he owes gratitude to are: Manisha Barman Roy, Munna and Manik Barman Roy, Dr Subimal Roy Barman, Dr Bhaskar Roy Barman, Rakhal Barman Roy (Rakhalda), Rupak Barman Roy and Smriti Chakraborty who told him in detail of Raja Man Singh who prominently figures in this book. This book, as the author tells us, is

gifted to his grandson Kian in the hope that he will continue the process of digging out the part of history not yet unearthed in this book, Then the author has dedicated next ten pages to dealing with the exploits of Raja Man Singh, one of the Navaratnas of Akbar's court, then goes on to tell of himself. In his autobiographical sketch he informs the readers of how he conceived of writing this book. His vast experiences from working at the Indira Gandhi International Airport immensely inspired him to write a book dealing with 'the dynastic history of Barman Roys/Roy Barmans' living in this country and abroad, 'who have tried to establish themselves with their dignity inherited from the time of Raja Man Singh of "AKBAR'S NAVARATNA SABHA"' (P.43). The author admits that the writing of this book has resulted from the loneliness thrust upon him by the death of his wife Ila Barman Roy.

Before entering into the text of the book, the author treats us to an elaborate pen-picture of Simul Kandi, a prosperous village in the jurisdiction of the Mymensing dictrict, of the time in which his grandfather Naba Kumar Barman Roy wielded power over it as an undeclared king, The author says he was told by his father Paresh Lal Barman Roy that Naba Kumar 'created a kingdom having six villages and a palatial building –symbolizing, maybe, a lineage from one Man Singh, a Rajput.' (P.52) Then he proceeds to elaborately deal with the natural and climatic conditions of Simul Kandi. Nothing of some importance is left untouched in the pen-picture.

The text is divided into four parts, each part self-contained and enriched with an autobiographical dimension. The autobiographical dimension makes the book pleasant reading

A glossary of technical terms and native words is provided for readers not acquainted with them.. The book ends with an epitaph to five relatives who died of the Corona Virus.